স্বাধীনতার যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজ

শিশিরকুমার বসু

ছবি

পার্থ সেনগুপ্ত

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ISBN 81-237-2015-7

প্রথম প্রকাশ : 1997 (শক 1919)

মূল্য : 9.50 টাকা

Swadhinotar Juddhey Azad Hind Fouz (*Bangla*)

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম পর্ব

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের দেশের পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস ভাল করে পড়ে কতকগুলি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।

প্রথম, তিনি দেখিয়েছিলেন যে অন্যান্য দেশ ও জাতির মতই আমাদের ইতিহাস উত্থান-পতনের ইতিহাস। দ্বিতীয়ত, তখনই আমাদের পতন হয়েছে যখন দেশ ও জাতি হিসাবে মানসিক দিক থেকে আমরা অবসন্ন হয়ে পড়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গে যখন আমরা সামরিক শক্তি হারিয়েছি। দুশো বছর আগে আমাদের মানসিক ও সামরিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অজুহাতে ইংরাজেরা আমাদের দেশে শিকড় গেড়ে বসে। ১৮৫৭ সালে দেশের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান হয়, যাকে সিপাই বিদ্রোহ বলা হয়। কিন্তু সঠিক ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের অভাবে ঐ চেষ্টা বিফল হয়ে যায়। তারপর ইংরাজেরা আমাদের সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে দেয় এবং ইংরাজ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র সরাসরি লণ্ডন থেকে দেশ শাসনের সব ব্যবস্থা করে। সারা দেশের শাসনযন্ত্র এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে নিজেদের দখলে ও নিয়ন্ত্রণে রাখে। ফলে আমরা ভারতবাসীরা ইতিহাসে এই প্রথম এক বিদেশীর কাছে পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হই।

অনেকদিন পর্য্যন্ত আমরা পরাধীনতার গ্লানি ও দুর্দ্দশা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলাম। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের

পর থেকে দেশে এক নবজাগরণ শুরু হয়। প্রথমে বিদেশীর নিয়মকানুন মেনে নিয়ে ভারতীয় নেতারা আবেদন নিবেদন করে নিজেদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি করার চেষ্টা করেন। বড় রকমের প্রথম আন্দোলন হয় যখন ইংরাজ শাসকরা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের এক পরিকল্পনা আমাদের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তার প্রতিবাদে সেই প্রথম বাঙ্গলায় স্বদেশীর মন্ত্র ও বিদেশী জিনিস বয়কটের আওয়াজ তোলা হয়। ঐ সময় গোপন সশস্ত্র বিপ্লবী কার্য্যকলাপও বাঙ্গলায়, পাঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে ও অন্যান্য জায়গায় শুরু হয়।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাঁধে। আমাদের দেশে তার প্রতিক্রিয়া দুইরকম হয়। প্রথমত, যারা নিয়মতান্ত্রিক পথে স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তাঁদের ইংরাজ শাসকেরা মিথ্যা আশ্বাস দেন যে যুদ্ধজয়ের পর স্বায়ত্তশাসনের দাবি বিবেচনা করা হবে। ঐ আশ্বাসের ভিত্তিতে যুদ্ধে তাঁদের সহযোগিতা আদায় করে নেন। অন্যদিকে বিপ্লবীরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে সশস্ত্র আন্দোলন চালান। উপরন্তু জার্মানি থেকে গোপনে অস্ত্র আমদানি করে ইংরাজদের উপর বড় রকমের আঘাত হানবার চেষ্টা করেন তাঁরা। আফগানিস্তানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একটি স্বাধীন বিপ্লবী ভারতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

যুদ্ধের পর কিন্তু ইংরাজ সরকার তাঁদের কোনও কথা রাখেন নি। বরঞ্চ দেশে নতুন করে শোষণের রাজ কায়েম করেন। শেষ পর্য্যন্ত ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালবাগে নিরস্ত্র নরনারী ও শিশুদের সমাবেশের উপর এক নৃশংস ও ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ভারতের জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়

যে স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার দাবি ইংরাজ সরকার বরদাস্ত করবেন না।

প্রতিরোধের কোন পথের সন্ধান খুঁজে না পেয়ে ভারতের জনগণ যখন দিশেহারা তখন ভাগ্যক্রমে দেশে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হয়। তিনি অহিংস অসহযোগ ও স্বদেশীয়ানার নতুন মন্ত্রে দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলেন। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার এক নতুন উপায় ও পথ আমরা খুঁজে পাই।

গান্ধীজির নেতৃত্বে বিশ ও তিরিশের দশকে বড় বড় গণ-আন্দোলন হয়, কিন্তু ইংরাজ সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার মত অবস্থায় আমরা পৌঁছতে পারিনি। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি নেতাজী সুভাষচন্দ্র ইংরাজ সরকার ও ভারতের মুক্তির লড়াই এর মধ্যে কার কতটা শক্তি বা কার কোথায় দুর্বলতা, যুক্তি দিয়ে এটা বিচার করে দেখান। তিনি বলেন যে একদিকে যেমন দেশের জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য অভূতপূর্ব ইচ্ছাশক্তি জাগিয়ে তোলা গেছে, অন্য দিকে তেমনই দেশে আমলাতন্ত্র, পুলিশ ও ফৌজের মধ্যে ইংরাজ সরকারের প্রতি আনুগত্য টলানো যায়নি। তিনি বলেন অহিংস উপায়ে যদি সত্যিই ইংরাজ শাসনকে অচল করে দিতে হয় তাহলে সর্ব্বাত্মক অসহযোগ ও পুরোপুরি কর বন্ধ আন্দোলনের দ্বারাই সেটা সম্ভব। সেজন্য তিনি বারবার বলতে থাকেন যে ঐ ধরনের আপোষহীন গণ আন্দোলনের জন্য দেশকে প্রস্তুত করতে হবে। তিনি ভারতে ইংরাজ সরকারকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি শক্তিশালী দুর্গের সঙ্গে তুলনা করেন এবং বলেন দুর্গটিকে চারদিক থেকে নিরস্ত্র অথচ শত্রুভাবাপন্ন দেশের জনগণ ঘিরে রয়েছে। দুটি উপায়ে দুর্গটিকে দখল করা যায়—এক, সর্ব্বাত্মক অসহযোগ এবং পুরোপুরি কর-বন্ধ আন্দোলন চালু করে

ইংরাজ সরকারকে ভাতে মারা; দুই, সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা তাদের আত্মসমর্পণ নিশ্চিত করা। তাঁর মতে এই দুইটি পথের আর কোনও বিকল্প ছিল না।

১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি হলেন। তিনি বুঝিয়ে বললেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সারা বিশ্বে নানা ধরনের চাপের মধ্যে রয়েছে এবং ইতিহাসের নিয়ম অনুযায়ী ঐ সাম্রাজ্যের পতনের যুগ আরম্ভ হয়েছে। ভারতবর্ষই হচ্ছে সাম্রাজ্যের মধ্যমণি। সুতরাং ঐ শুভমুহূর্তে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীদের কর্তব্য আপোষহীন এবং সর্ব্বাত্মক গণসংগ্রাম শুরু করা, যার ফলে আমাদের দেশ শীঘ্রই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। কিন্তু ১৯৩৮-এর শেষের দিকেই তিনি বুঝলেন যে গান্ধীজি এবং কংগ্রেসে তাঁর অনুগামী নেতৃবৃন্দ চূড়ান্ত এক গণসংগ্রামের দিকে এগোতেই চান না। পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবি কমিয়ে এনে ইংরাজ সরকারের সঙ্গে একটি আপোষে রফায় আসতে চান। সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে ভারতের জনগণ বড় লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত, যদিও গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামী নেতৃবৃন্দ, যাঁরা কংগ্রেসের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ, ক্লান্ত ও নৈরাশ্যের শিকার। সুভাষচন্দ্র তাঁর সংগ্রামী কর্মসূচী জোরদার করার জন্য ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয়বার সভাপতি পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়ালেন। গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী সুভাষচন্দ্রকেই জয়ী করলেন। নির্বাচনের ফল স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত লড়াইএর পক্ষে কংগ্রেস সংগঠনের রায় বলে মেনে না নিয়ে গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীরা নেতাজীকে পুরোপুরি একঘরে করবার উপায় অবলম্বন করলেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসে নেতাজী দেখলেন যে তথাকথিত বামপন্থীরাও তাঁর পক্ষ অবলম্বন করলেন না। শেষ পর্য্যন্ত ১৯৩৯-এর মার্চ

মাসে নেতাজী সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন।

১৯৩৯-এ ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময় নেতাজী বলেছিলেন যে ছয় মাস পরেই ইউরোপে যুদ্ধ বেধে যাবে। ভারতবাসীদের উচিত হবে ইংরাজ সরকারকে ছয় মাসের এক চরমপত্র দেওয়া এবং স্বাধীনতার দাবি যদি তারা মেনে না নেয় তাহলে চূড়ান্ত লড়াই আরম্ভ করা। দুঃখের বিষয় ঐ সঙ্কট মুহূর্তে নেতাজীর প্রস্তাবে কেউই—দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী অন্য দলগুলি সাড়া দেন নি।

ত্রিপুরী কংগ্রেসে তিক্ত অভিজ্ঞতার পর থেকেই নেতাজী দেশের মধ্যে বড় রকমের লড়াইএর সম্ভাবনা না থাকায় বিকল্প পথের কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। সারাদেশব্যাপী অহিংস অসহযোগ, আইন অমান্য ও কর বন্ধ আন্দোলনে গান্ধীবাদী কংগ্রেস ও তথাকথিত বামপন্থীরা কোনই আগ্রহ দেখান নি। শুরু বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশের বাইরে চলে গিয়ে স্বাধীনতার জন্য ইংরাজ সরকারের উপর বড় রকমের কোনও আঘাত হানা যায় কিনা তিনি বিচার করতে থাকেন। ১৯৩৯-এর মাঝামাঝি প্রগতিবাদী ও বামপন্থী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রামের প্রস্তুতি এগিয়ে নিয়ে যাবার তিনি একবার শেষ চেষ্টা করেন এবং নিজের দল ফরওয়ার্ড ব্লকের মাধ্যমে যুদ্ধ বিরোধী ও স্বাধীনতার জন্য শেষ লড়াইএর পক্ষে সারা দেশ সফর করে প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু উপযুক্ত সংগঠনের অভাবে অল্প সময়ের মধ্যে বড় রকমের গণসংগ্রাম গড়ে তোলা সম্ভব হয় না এবং বিকল্প পথের সন্ধান জরুরি হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় পর্ব

নেতাজী ইতিহাস বিচার করে দেখিয়েছিলেন যে কোন স্বাধীনতার যুদ্ধ দেশের বাইরে থেকে কম বেশী সমর্থন ও সাহায্য ছাড়া জয়যুক্ত হয়নি। আমেরিকা তার মুক্তিযুদ্ধে ফ্রান্সের সাহায্য পেয়েছিল, তেমনই চেকোশ্লোভাকিয়া স্বাধীনতার জন্য ইংলণ্ডের সাহায্য নিয়েছিল। আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তিযুদ্ধের নেতারা আমেরিকার সমর্থন ও সাহায্য চেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন। অবশ্য কোন্ বিদেশী রাষ্ট্র থেকে সমর্থন ও সাহায্য পাওয়া যাবে সেটা নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর। আমাদের শত্রু ইংরাজ সাম্রাজ্যের শক্তি খর্ব হলে কোন্ বিদেশী রাষ্ট্রের সুবিধা ও স্বার্থসিদ্ধি হবে তার উপর। তিনি ঠিক করলেন যে দেশের বাইরে গিয়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখে ও বুঝে এমন কোন পথ তিনি খুঁজে বের করবেন যাতে দেশের ভিতর বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করা যায়।

১৯৩৯-এ তিনি চীনে চলে যাবার কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়কার চীনা সরকার সেখানে নেতাজীকে আশ্রয় দিতে রাজি হয়নি। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে জার্মানির সঙ্গে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ বেধে যায়। ১৯৪০-এর প্রথমে ফ্রান্সের পতন হয় এবং ইংরাজেরা জার্মানদের কাছে পর্য্যুদস্ত হয়ে ইউরোপ থেকে হটে গিয়ে নিজেদের দ্বীপে আশ্রয় নেয়। যুদ্ধ আরম্ভ হবার ঠিক আগেই জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে একটা পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তি করে। নেতাজীর বিবেচনায় এই পরিস্থিতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষে খুবই সুবিধার ছিল এবং তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করার জন্য নিজেই দেশের বাইরে চলে গিয়ে সক্রিয়

কিছু করার পরিকল্পনা করতে আরম্ভ করেন।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অনেক বিপ্লবী দেশের উত্তরপশ্চিম সীমান্তের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার ভিতর দিয়ে ইংরাজদের চোখে ধুলো দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে গোপনে পালিয়ে আফগানিস্থান, রাশিয়া ও জার্মানিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং বাইরে থেকে নানাভাবে দেশের ভিতরে বিপ্লবাত্মক আন্দোলন জোরদার করার চেষ্টা করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ঐ একই পথে গোপনে রাশিয়া ও ইউরোপ চলে যাবার আয়োজন ১৯৪০-এর প্রথমেই শুরু করেন। ১৯৩৯-৪০এ সারাভারত সফরের সময় তিনি উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা মিয়া আকবর শাহকে এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই সময় পাঞ্জাবে কিরতি কিষান পার্টি বলে একটি বামপন্থী দল ছিল। ঐ দলের নেতারা সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন ও স্বীকৃতি পাবার চেষ্টা করছিলেন। কলকাতার ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সরদার নিরঞ্জন সিং তালিবের মাধ্যমে ঐ দলের সঙ্গে নেতাজী যোগাযোগ করেন। কিরতি কিষান নেতা অচ্ছর সিং চীমা কলকাতায় নেতাজীর সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই জুলাই মাসের প্রথমে নেতাজী গ্রেপ্তার হন। ফলে সব আয়োজন স্থগিত হয়ে যায়। প্রেসিডেন্সী জেলে থাকার সময় নেতাজী বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার দলের নেতৃস্থানীয় হেমচন্দ্র ঘোষ ও সত্যরঞ্জন বক্সীর সঙ্গে নিজের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কথাবার্তা বলেন। যদি নিজে সময়মত মুক্তি না পান তিনি বিশ্বস্ত কোন কোন সহকর্মীকে রাশিয়া ও ইউরোপ পাঠাবার চেষ্টা করেন। যেমন, জেলে তাঁর সাথী নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর মুক্তির সম্ভাবনা হওয়ায় তাঁকে গোপনে বিদেশে পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুতি



নিতে বলেন। তাঁর হাতে লুকিয়ে রাশিয়া ও জার্মানির রাষ্ট্রপ্রধানদের নামে চিঠিও দিয়ে দেন। জেলে সাক্ষাতের সময় শরৎচন্দ্র বসুকে নেতাজী বলেন তিনি যেন মিয়া আকবর শাহকে ডেকে পাঠিয়ে গোপনে রাশিয়া চলে যেতে বলেন। পরে নিজে রাশিয়া ও ইউরোপ যাবার প্রস্তুতি হিসাবে বিদেশী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আগাম যোগাযোগের জন্য সম্ভবত নেতাজী বিশ্বস্ত সহকর্মীদের পাঠাতে চেয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী থাকার সময়ই নেতাজী বিদেশ যাত্রার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেন। সরকার তাঁর বিরুদ্ধে একদিকে যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা করার জন্য দেশদ্রোহের অভিযোগে মামলা রুজু করে এবং অন্যদিকে যুদ্ধকালীন ভারত রক্ষা আইনের বিনা বিচারে আটক করার বিধি অনুযায়ী তাঁকে বন্দী করে রেখেছিল, কোর্টের মামলায় জামিন পেলেও যাতে তারা তাঁকে ভারত রক্ষা

আইনে আটক রাখতে পারে। নেতাজী নিজের বন্দিদশা সম্পূর্ণ বেআইনী বলে সরকারকে কয়েকটি ঐতিহাসিক চিঠি লেখেন এবং নিজের মুক্তি দাবি করেন। সরকার কিন্তু খুবই অনমনীয় মনোভাব নেয় এবং তাঁকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করে। তাঁর শেষ চিঠিটিকে তিনি তাঁর 'জীবনের বাণী' বলে চিহ্নিত করেন এবং সরকারকে বলেন যে হয় তারা তাঁকে মুক্তি দেবে, নতুবা তিনি আমরণ অনশন করবেন। তাঁর চরমপত্র সরকার অগ্রাহ্য করায় তিনি ১৯৪০-এর ২৯ নভেম্বর অনশন শুরু করেন। বাঙ্গলার সরকারের উপর ভারত সরকারের নির্দেশ ছিল যে যতদিন যুদ্ধ চলবে তাঁরা যেন কোন কারণেই নেতাজীকে জেল থেকে না ছাড়েন। কিন্তু সাতদিন অনশনের পর তাঁর শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। বাঙ্গলার সরকার ও ইংরাজ গভর্নর জেলে নেতাজীর মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে ভয় পেয়ে যান এবং ৫ই ডিসেম্বর তাঁকে বিনাশর্তে মুক্তি দেন। তাঁদের মতলব ছিল যে নেতাজীর সঙ্গে বিড়াল-মূষিকের খেলা খেলবে এবং দায়ে পড়ে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেও তাঁর স্বাস্থ্য একটু ভাল হলেই তাঁকে জেলে পুরে দেবে।

মুক্তি পাবার পর তিনি একটুও সময় নষ্ট না করে দেশ থেকে গোপনে বেরিয়ে যাবার পরিকল্পনা করতে আরম্ভ করেন। শরৎচন্দ্র বসুর ছেলে ও তাঁর ভাইপো শিশিরকুমারকে তিনি ডেকে পাঠান এবং প্রায় দেড় মাস ধরে দিনের পর দিন রাতের পর রাত এ বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি ঠিক করেছিলেন যে শিশির আগে গাড়ি চালিয়ে এক রাতে কলকাতা থেকে দূরে কোনও এক রেলস্টেশনে পৌঁছে দেবে। রেলে চেপে তিনি দিল্লী হয়ে পেশোয়ার চলে যাবেন। পেশোয়ার থেকে সীমান্ত পেরিয়ে আফগানিস্তান পাড়ি দেবার ব্যবস্থার জন্য তিনি মিয়া আকবর শাহকে কলকাতায়

ডেকে পাঠান। আকবর শাহের সঙ্গে কলকাতায় তিনি শিশিরের পরিচয় করিয়ে দেন। ঠিক হয় যে তিনি মধ্য ভারতের এক মুসলমান ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে গোপন যাত্রা শুরু করবেন। নাম নিলেন মহম্মদ জিয়াউদ্দীন, যাঁর পেশা এক জীবনবীমা কোম্পানির প্রতিনিধি। আকবর শাহ্ ও শিশির মিলে তাঁর ছদ্মবেশের কাপড়চোপড় ও জিনিসপত্র কেনেন। প্ল্যান অনুযায়ী নেতাজী আত্মীয়স্বজনদের বলেন যে তিনি কিছুদিনের জন্য নির্জনবাস করবেন, কারোর সঙ্গে দেখা করবেন না বা কথা বলবেন না। তিনি অবশ্য ঠিক করেছিলেন, যেদিন তাঁর ঘোষিত নির্জনবাস শুরু হবে সেদিন রাতেই তিনি শিশিরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়বেন। তিনি যে তাঁর নিজের শোবার ঘরে নির্জনবাস করছেন, এই ব্যাপারটি কয়েকদিন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর ভাইঝি ইলাকে বেছে নিয়েছিলেন। পরে পুলিশের জুলুমের মোকাবিলা করার জন্য আরও দুজন ভাইপো দ্বিজেন্দ্রনাথ ও অরবিন্দকে এই কাজে সামিল করা হয়।

যখন অতি গোপনে নেতাজী সব আয়োজন করছিলেন তখন শরৎচন্দ্র বসু কলকাতার বাইরে ছিলেন। ১৯৪১-এর জানুয়ারীর প্রথমেই শরৎ বসু কলকাতায় ফিরে এলেন। তখন দুই ভাইএর মধ্যে গোপন আলোচনা হয় এবং অন্তর্ধানের প্ল্যানটির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়।

মিয়া আকবর শাহের সঙ্গে নেতাজী ঠিক করেছিলেন যে তিনি ১৯ জানুয়ারী পেশোয়োর পৌঁছবেন এবং ইতিমধ্যে আকবর শাহ্ সীমান্ত পার হবার সব ব্যবস্থা করে রাখবেন। কলকাতা থেকে গাড়িতে রওনা হবার দিন হল ১৬ জানুয়ারী সন্ধ্যায়। বিহারের কোনও রেলস্টেশন থেকে ১৭ জানুয়ারী উত্তর পশ্চিম গামী ট্রেন ধরে দিল্লী হয়ে ১৯ জানুয়ারী সন্ধ্যায় তিনি পেশোয়ার পৌঁছবেন।

কলকাতা থেকে মোটর গাড়িতে রাতে বেরিয়ে তার পরের দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নেতাজী কোথায় লুকিয়ে থাকবেন সেটাও ঠিক করা হল। ধানবাদের কিছু দূরে বারারি বলে একটি ছোট জায়গায় শিশিরের দাদা অশোকনাথ কাজ করতেন। তাঁর বাড়িতে দিনের বেলাটা গা ঢাকা দিয়ে থাকাটাই সুবিধার মনে হল।

শিশিরকুমার এলগিন রোডের বাড়ির খুবই কাছে শরৎচন্দ্র বসুর উডবার্ন পার্কের বাড়িতে থাকতেন। তিনি তখন ছিলেন ডাক্তারির ছাত্র। নেতাজীর গোপন যাত্রার জিনিসপত্র, একটি স্যুটকেশ, একটি ছোট অ্যাটাচি ও বিছানা শিশির নিজের কাছেই লুকিয়ে রাখলেন। বাক্সগুলির উপর নেতাজীর ছদ্মনামের দুটি অক্ষর M. Z. লিখিয়ে নিলেন। ইংরেজিতে ছদ্মনামের ভিজিটিং কার্ডও ছাপানো হল। তাতে লেখা ছিল :

মোহম্মদ জিয়াউদ্দিন বি.এ. এল.এল.বি

ট্রাভেলিং ইন্সপেক্টর

দ্য এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লি.

স্থায়ী ঠিকানা :

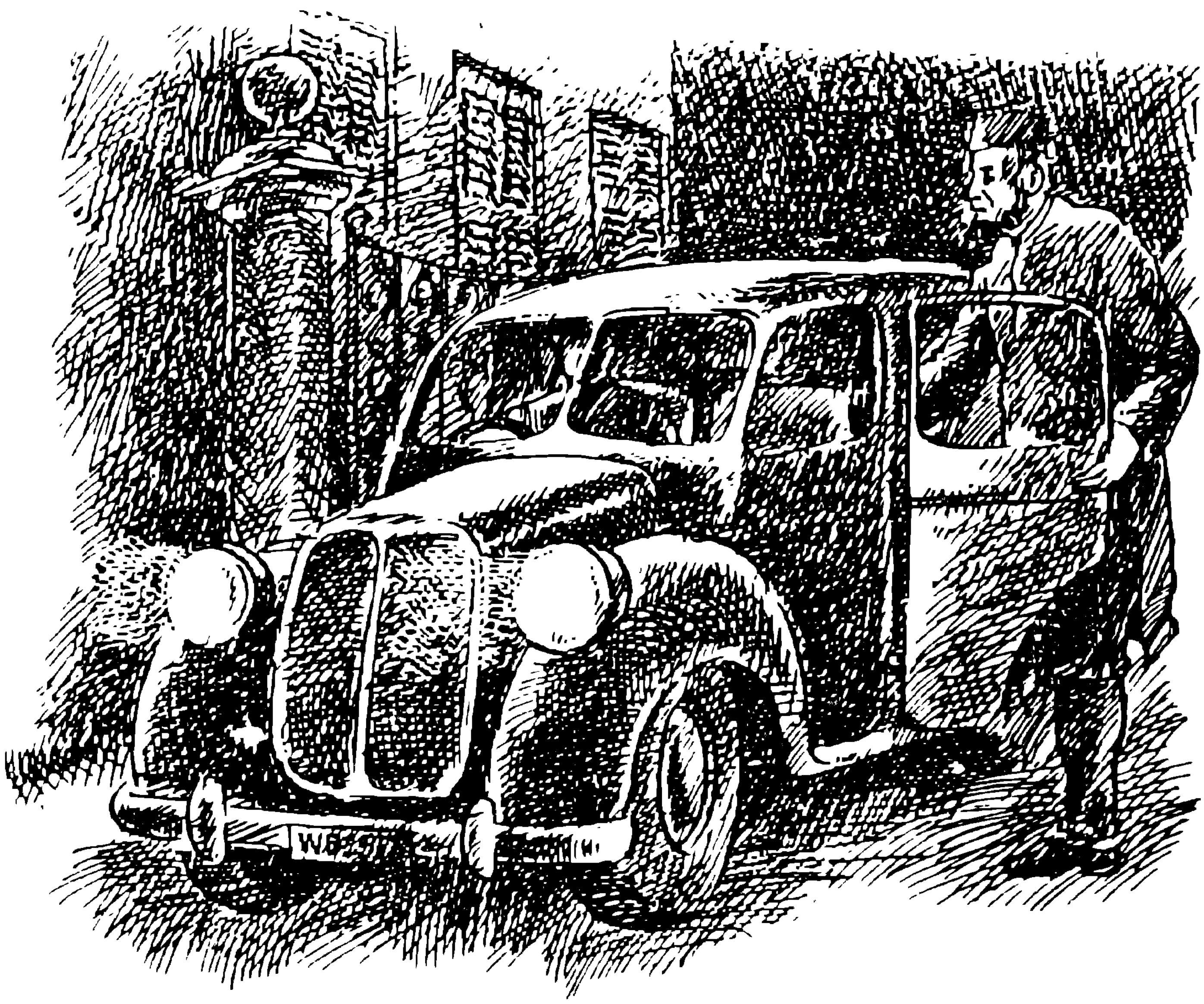
সিভিল লাইন্স, জব্বলপুর

রওনা হবার ৪৮ ঘণ্টা আগে নেতাজী শিশিরকে বললেন যাত্রার সব ব্যবস্থা ও আয়োজন সম্পূর্ণ করতে। দেশের মুক্তির সন্ধানে তুলনাহীন ও দুঃসাহসিক এক অভিযানের জন্য সুভাষচন্দ্র প্রস্তুত হলেন।

তৃতীয় পর্ব

১৯৪১-এর ১৬ জানুয়ারী রাত ৯টায় শিশির গাড়ি চালিয়ে এলগিন রোডের বাড়িতে ঢুকলেন। বাড়ির পিছন দিকে রান্নাবাড়ির সিঁড়ির পাশে গাড়ি রেখে উপরে গেলেন। গাড়িটি ছিল জার্মানিতে তৈরী 'ওয়াণ্ডারার'। সবই স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। কিন্তু বাইরের পুলিশের চরদের চোখে ধুলো দিয়ে বাড়ির এতগুলো লোকের নজর এড়িয়ে তিনি কি করে বেরোবেন? গত একমাস ধরে পুলিশের চরেরা এলগিন রোডের ও উডবার্ন পার্কের বাড়ির উপর নজর রাখত। শিশির তাদের গতিবিধি ও আচরণের উপর লক্ষ্য রেখেছিলেন। বেশ রাত পর্য্যন্ত তারা টহল দিত। তারপর সব শান্ত হয়ে গেলে মোড়ের কাছে একটি তক্তপোশের উপর কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। বাড়িতে একটি অ্যালসেসিয়ান কুকুর ছিল। তাকে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা নেতাজী আগে থেকেই করিয়েছিলেন। ৯টা নাগাদ নেতাজী তাঁর মা ও বাড়ির মহিলাদের তাঁর ঘরে ডেকে নির্জন ব্রত পালনের আগে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু খেলেন এবং সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে প্রায় সকলেই তারপর একে একে শুতে চলে গেলেন। কিন্তু দুইজন সন্দিহান হয়ে তাঁর ঘরের কাছে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। নেতাজীর ব্যক্তিগত পরিচারক করুণাকে বলা হল সদর দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়তে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত নেতাজী নিশ্চিন্ত না হলেন যে বেরোবার রাস্তায় কোনও বাধা নেই, ততক্ষণ তিনি অপেক্ষা করলেন। ফলে অনেক দেরী হয়ে গেল। রাত দেড়টায় যাত্রা শুরু হল। দ্বিজেন্দ্রনাথ তিনতলায় গেলেন রাস্তার উপর নজর রাখতে। অরবিন্দ বিছানাটা হাতে নিয়ে এগোলেন। ইলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেতাজী

ঘর থেকে বেরোলেন। শিশির ওঁর পিছনে পা টিপে টিপে এগোলেন। লম্বা বারান্দা পেরিয়ে পিছনের খোলা সিঁড়ি দিয়ে তাঁরা গাড়ির কাছে পৌঁছোলেন। নেতাজী পিছনের সীটে বসলেন,



কিন্তু দরজা বন্ধ করলেন না। শিশির বেশ খানিকটা আওয়াজ করে চালকের সীটে বসে দরজা বন্ধ করলেন। যদি কেউ জেগে থাকে তো শুনল একটাই দরজা বন্ধ হল। বাইরের গেট খোলা ছিল। সহজেই গাড়ি স্টার্ট নিল এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডান দিকে ঘুরল। নেতাজী শিশিরকে বলে দিয়েছিলেন প্রথমে দক্ষিণে যেতে, যাতে যদি পুলিশের লোক জেগে থাকে তো দেখবে গাড়ি উল্টো দিকে গেল। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সার্কুলার রোড দিয়ে শিয়ালদহ-হ্যারিসন রোড হয়ে হাওড়াব্রিজ পেরিয়ে গ্র্যাণ্ড

ট্রাঙ্ক রোডে পড়ে 'ওয়াণ্ডারার' বর্ধমানের দিকে এগোলো। বর্ধমান পর্য্যন্ত রাস্তা আঁকাবাঁকা। সাড়ে তিনটের পর বর্ধমান পিছনে রেখে শিশির আসানসোলের পথ ধরলেন। পথে পড়ল দুর্গাপুরের ঘন জঙ্গল, তার মধ্যে দিয়ে লালমাটির পথ। এ অঞ্চলে তখন ডাকাতের উপদ্রবও ছিল। চাঁদের আলোয় ও গাড়ির হেডলাইটের আলোয় পরিবেশ রোমাঞ্চকর হয়ে উঠল। হঠাৎই একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল। একপাল মোষ আচমকা রাস্তার উপর এসে পড়ল। শিশির কোনমতে ব্রেক কষে গাড়ি থামালেন। মোষগুলো গাড়ির চারদিকে ধাক্কা-ধাক্কি করে রাস্তার অন্য পারে চলে গেল। যখন গাড়ি আসানসোল এল, তখন ভোর হয়েছে। শিশির গাড়িতে খানিকটা পেট্রল ভরে নিয়ে ধানবাদের দিকে এগোলেন। গাড়িতে নেতাজী নানারকম কথাবার্তা বলছিলেন ও শিশিরকে মাঝে মাঝে কফি খাওয়াচ্ছিলেন। তিনি ঘুমোন নি কারণ তাহলে চালকেরও ঘুম পেতে পারে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে ধানবাদের দিকে মোড় নেবার আগে গোবিন্দপুর চেক্ পোস্ট-এর গার্ড গাড়ির নম্বর নিল। নেতাজী খানিকটা চিন্তিত হলেন। ধানবাদের মধ্যে দিয়ে শিশির জোরে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তখন সকাল ৯টা। রাস্তায় লোকজন গাড়ি ঘোড়ার ভিড় বাড়ছে। বাররির পথ ধরতে শিশিরের খুব অসুবিধা হল না, কারণ দুই সপ্তাহ আগেই তিনি একবার এ অঞ্চলটা ঘুরে দেখে গেছেন। দূর থেকে দুটো বাংলো চোখে পড়ল। ওর মধ্যে একটিতে অশোকনাথ বসু সস্ত্রীক থাকেন। বাড়িটা ভাল করে দেখে নিয়ে নেতাজী গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। শিশির একলা গাড়ি চালিয়ে দাদার বাড়ি ঢুকলেন। লোকজন তাই দেখল। শিশির তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে অশোকনাথকে জানালেন নেতাজী কিছুক্ষণের মধ্যেই

ছদ্মবেশে এসে পড়বেন। কী করতে হবে নেতাজী তার পুরোটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন, পাখি পড়ানোর মত শিশির দাদাকে তা বলে দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই নেতাজী পায়ে হেঁটে বাড়ি পৌঁছলেন এবং বাইরের লোকজনকে বললেন তিনি বাড়ির কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চান। সারাদিন ধরে নেতাজীকে ঘিরে এক অভিনব নাটক চলল। জীবন বীমা সংক্রান্ত কথাবার্তার জন্য অশোকনাথের তখন সময় না থাকায় বীমা কোম্পানির প্রতিনিধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাইরের ঘরে অতিথির মত থাকলেন।

সন্ধ্যায় নেতাজী অশোকনাথকে জানালেন তিনি গোমো স্টেশন থেকে ট্রেন ধরতে চান। শিশির ওই রাস্তাটা ভাল চিনতেন না। সুতরাং স্থির হল অশোকনাথ ও তাঁর স্ত্রী মীরা গাড়িতে থাকবেন। সন্ধ্যার পর লোকজনের সামনে ইংরাজি ভাষায় বিদায় নিয়ে নেতাজী বাড়ি থেকে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বেড়াতে যাবার অছিলায় শিশির, অশোক ও মীরা গাড়ি চেপে বেরোলেন। কিছুদূরে অন্ধকারে নেতাজী অপেক্ষা করছিলেন, ওঁকে তুলে নিয়ে গাড়ি গোমোর পথে এগোলো, গোমো স্টেশনে অশোক ও শিশির কুলির হাতে জিনিসপত্র তুলে দিলেন। নেতাজী দুই ভাইপোর দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন, —'আমি চললাম, তোমরা ফিরে যাও।' নেতাজী দৃঢ় পদক্ষেপে ওভারব্রিজ পেরিয়ে ওপারের প্ল্যাটফর্মের দিকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। স্টেশনের বাইরে গাড়ি থামিয়ে শিশির খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। দিল্লি-কালকা মেল ভোঁ বাজিয়ে যাত্রা শুরু করল। পরেশনাথ পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আলোর মালার মত ধীরে ধীরে ট্রেনটি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পরের দিন কলকাতায় ফিরে শিশির শরৎ বসুকে সফল যাত্রার বিবরণ দিলেন। কথা ছিল পরের দিন সন্ধ্যায় দিল্লি পৌঁছে নেতাজী

সেখান থেকে ফ্রন্টিয়ার মেল ধরবেন এবং ১৯ জানুয়ারী সন্ধ্যায় পেশোয়ার পৌঁছোবেন। ট্রেনে যাত্রার সময় তিনি একা।

১৯ জানুয়ারী মহম্মদ জিয়াউদ্দীনের ছদ্মবেশে নেতাজী পেশোয়ার স্টেশনে নামলেন। আকবর শাহ তাঁকে চিনে নিলেন এবং ইশারায় তাঁকে একটি টাঙ্গায় চাপতে বললেন। প্রথমে নেতাজী তাজমহল হোটেলে গেলেন।

দুর্গম যাত্রাপথে সহায়তা করবার জন্য আকবর শাহ তিনজনের কথা ভেবেছিলেন। এঁরা হলেন আবাদ খান, মহম্মদ শাহ ও ভগতরাম তালওয়ার। সবাই ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মী। শেষের দুজন আকবর শাহের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের বেছে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ভগতরাম কিরতি কিষান পার্টিরও কর্মী ছিলেন এবং পার্টির স্বার্থে আকবর শাহের উপর খুবই চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। হোটেলে পৌঁছে শহরে ফেরার পথে আবাদ খানের সঙ্গে আকবরের দেখা হয়ে গেল। আবাদ খান জোরের সঙ্গে বললেন নেতাজীকে হোটেলে রাখা ঠিক নয়, তাঁর নিজের বাড়িতেই তাঁকে তুলবেন, যদিও তিনি সাধারণ গৃহস্থ। নেতাজীকে সেই রাতেই আবাদ খানের বাড়িতে সরিয়ে আনা হল। আবাদ খান তাঁকে পাঠানদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি শেখাতে লাগলেন। আবাদ খানের যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল এবং তিনি আফগানিস্তানের পথ খুব ভালভাবে জানতেন। তিনি নেতাজীর জন্য পাগড়ি সমেত পাঠানদের পোশাক তৈরি করিয়েছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হল যে ভগতরাম নেতাজীর সঙ্গে যাবেন এবং আবাদ খান একজন গাইড দেবেন।

২৬ জানুয়ারী সকালে আবাদ খানের গাড়িতে ভগতরাম, মহম্মদ শাহ ও গাইডকে সঙ্গে নিয়ে ইংরাজদের ও উপজাতি



সীমান্তের চেকপোস্ট জামরুদের দিকে রওনা দিলেন নেতাজী। নেতাজীর সীমান্ত পার হওয়া পর্যন্ত মহম্মদ শাহ অপেক্ষা করলেন।

একই দিনে ও একই সময়ে কলকাতায় এলগিন রোডের বাড়ি থেকে তাঁর নিরুদ্দেশ হবার খবর প্রচার করা হল। কিভাবে খবরটি প্রচার করা হবে সে বিষয়ে শরৎচন্দ্র বসু বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেদিনই বিকেল থেকে পুলিশ দপ্তর খোঁজ খবর ও জোর তদন্ত আরম্ভ করল। কিন্তু নেতাজী ততক্ষণে তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছেন।

চতুর্থ পর্ব

সীমান্ত থেকে কিছু দূরে খাজুরি ময়দানে ইংরাজদের একটি ঘাঁটি ছিল। সেটা পেরিয়ে শিনওয়ারি উপজাতিদের এলাকা থেকে মাইল খানেক দূরে গাড়ি থেকে নেতাজী, ভগতরাম ও গাইড নেমে পড়লেন। সীমান্ত পেরিয়ে একটি দরগা ছিল। সীমান্ত রক্ষী ধরে নিল তাঁরা দরগায় প্রার্থনা করতে যাচ্ছেন এবং ফিরে আসবেন। আরও খানিকটা এগিয়ে যখন ক্লান্ত হয়ে তাঁরা বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন ভগতরাম নেতাজীকে জানালেন, তাঁরা ব্রিটিশ এলাকার বাইরে চলে এসেছেন। শুনে নেতাজী খুবই খুশি হলেন।

পরের ৪-৫ দিন ধরে উপজাতি এলাকার মধ্যে দিয়ে কাবুল যাত্রা। খুবই কষ্টসাধ্য, দুঃসাহসিক ও রোমাঞ্চকর অভিযান। প্রথমেই পাহাড়ে উঠতে হল এবং রাতে পাহাড়ের চূড়ায় এক মসজিদে রাত্রি বাস করা হল। কন্‌কনে ঠাণ্ডার সময়, চারদিকে বরফ পড়ছে। পথে নানা মানুষের প্রশ্নের উত্তরে ভগতরাম বানিয়ে বানিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জবাব দিচ্ছিলেন। নেতাজী ওঁর কাকা। তিনি কালা ও বোবা, সুতরাং তিনি ইশারা ছাড়া কথা বলেন না। ২৭শে জানুয়ারী সকালে তাঁরা আবার চলতে শুরু করলেন। দুপুরে একটা বড় গ্রামে পৌঁছে নেতাজীর জন্য একটি ছোট ঘোড়ার ব্যবস্থা করা হল। ঘোড়াটি আফগানিস্তান সীমান্তের ভেতরে প্রথম গ্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবে তাঁকে। পথে আরও একটি উঁচু পাহাড় পড়ল। গভীর রাতে বরফে ঢাকা পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে নেতাজীর ঘোড়া পিছলে পড়ল। নেতাজী পড়ে গেলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বিশেষ কোনও চোট লাগল না। ২৮শে জানুয়ারী প্রথম আফগান গ্রামে তাঁরা পৌঁছে গেলেন। রাতটা গ্রামে এক নব দম্পতির

অতিথি হয়ে তাঁরা কাটালেন। এখান থেকে পেশোয়ার-কাবুল রোড পর্য্যন্ত নেতাজীর জন্য আরও একটি ঘোড়ার ব্যবস্থা হল। ২৯ জানুয়ারী সকাল ৯টায় নেতাজী ও তাঁর দুই সাথী আফগানিস্তানের গারদি গ্রামে পৌঁছে গেলেন। পেশোয়ার-কাবুল রোড ধরে ওঁরা হেঁটে এগোলেন - গন্তব্য স্থল জালালাবাদ। বিকেলে চায়ের বাক্স বোঝাই একটা ট্রাকে চেপে বসলেন। রাত ৮টায় জালালাবাদ পৌঁছোলেন। ২৯ তারিখ রাতটা একটি হোটেলে কাটালেন। জালালাবাদের কাছেই আড্ডা শরিফ। সেখানে দরগায় প্রার্থনা করবার অছিলায় গেলেন। কিন্তু আসলে হামি মহম্মদ আসিন নামে এক ইংরাজ বিদ্বেষী ও বিপ্লবীদের বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ২৯ জানুয়ারী দিনটা নেতাজী রেখেছিলেন। সন্ধ্যায় জালালাবাদ ফিরে পরদিন সকালে টাঙ্গায় চেপে কাবুলের পথে সুলতানপুর হয়ে ফতেহাবাদ পৌঁছোলেন। তারপর আরও দশ মাইল হাঁটলেন। শেষ পর্য্যন্ত চায়ের বাক্স বোঝাই আরও একটি ট্রাক পাওয়া গেল। রাত ৯টায় পেশোয়ার ও কাবুলের মাঝামাঝি গাণ্ডামাক-এ খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার তাঁরা রওনা হলেন। পাহাড়ি রাস্তায় চায়ের বাক্সের উপর খোলা ট্রাকে বসে পাঁচ ঘণ্টা কন্‌কনে ঠাণ্ডায় কাটাতে হল। ভোরে বুডখার্ক বলে এক জায়গায় পৌঁছে দেখলেন সেখানে যাত্রীদের খুব ভালভাবে পরীক্ষা করা হয়। যাই হোক নেতাজী ও ভগতরাম খুব কায়দা করে পার পেয়ে গেলেন। ৩১শে জানুয়ারী সকাল ৯টায় টাঙ্গা চেপে বেলা ১১টায় কাবুল পৌঁছে গেলেন। লাহোরি গেটের কাছে একটি সরাইখানায় আশ্রয় নিলেন। আসবাবপত্র কিছুই নেই। বাজার থেকে সস্তার কিছু বিছানাপত্র ও গরমজামা কেনা হল।

সব বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে কাবুল পৌঁছোতে পারাটা অবশ্যই

একটা বড় সাফল্য। এখন থেকে শুরু হল নেতাজীর জীবনের চরম লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের কঠিনতম অধ্যায়।

নেতাজীর প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে দেশের বাইরে থেকে সক্রিয় ও বড় রকমের কিছু করা যাতে দেশের ভেতরেও গণ আন্দোলন শুরু করা যায় এবং বিপ্লবের পথে ব্রিটিশদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া যায়। কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের আশ্রয় নিয়ে বসে দিন কাটানোর জন্য তিনি জীবনের এত বড় ঝুঁকি নেননি। আফগানিস্তানের উত্তর সীমান্তে সোভিয়েত রাশিয়া। রাশিয়া তখন যুদ্ধে নেই, জার্মানির সঙ্গে একটা চুক্তি করেছে। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে রাশিয়া ভারতের মত পরাধীন জাতির স্বাধীনতার লড়াইয়ের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে বলে নেতাজী আশা করেছিলেন। প্রথমেই নেতাজী ভগতরামকে সঙ্গে নিয়ে নানাভাবে কাবুলের রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন। এমনকি একদিন বরফে ঢাকা কাবুলের রাস্তায় রাষ্ট্রদূতের গাড়ি আটকে ভগতরাম রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বললেন ও নেতাজীকে দূর থেকে চিনিয়ে দিলেন কিন্তু রাশিয়ার দিক থেকে কোনও সাড়া এল না। কিরতি কিষান নেতা অচ্ছদ সিং চীনা কিছুদিন আগে থেকেই মস্কোতে ছিলেন। তিনি রাশিয়ানদের সঙ্গে কোনও ব্যবস্থাই যে করতে পারেন নি সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

কাবুল পৌঁছোনোর সাতদিনের মধ্যেই নেতাজী একদিন জার্মান দূতাবাসে একলাই ঢুকে পড়লেন। দূতাবাসের অফিসাররা তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হল। তখনই তাঁরা নেতাজীকে আশ্রয় দিতে না পারলেও নেতাজীর খবর ও বার্তা বার্লিনে পাঠাতে রাজী হলেন। ঠিক হল কাবুলে জার্মানির

সিমেন্স কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার টমাসের মারফত ভগতরাম যোগাযোগ রাখবেন।

এরমধ্যে কাবুলে আত্মগোপন করে থাকার ব্যাপারে নেতাজীকে বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হল। স্বাস্থ্য তাঁর ভাল যাচ্ছিল না। এক গোয়েন্দা সন্দিহান হয়ে বারবার সরাইয়ে এসে বিরক্ত করতে লাগল। নিরুপায় হয়ে ভগতরাম কাবুলের এক ভারতীয় ব্যবসায়ী উত্তমচাঁদ মালহোত্রার সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন নেতাজীকে যাতে তাঁর বাড়িতে রাখা যায়। উত্তমের সঙ্গে ভগতরামের দশ বছর আগে পেশোয়ারে পরিচয় ছিল এবং একসঙ্গে জেলেও ছিলেন। উত্তমচাঁদের এক প্রতিবেশীর সন্দেহজনক আচরণের জন্য আবার দিন কয়েকের জন্য নেতাজীকে আর একটি সরাইয়ে সরে যেতে হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য আবার উত্তমচাঁদের বাড়িতেই ফিরে এলেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত জার্মানদের কাছ থেকে ইতিবাচক কোনও খবর এল না। তখন নেতাজী ও ভগতরাম বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবলেন। আফগান ও রাশিয়ার সীমান্তে দু-একজন দুষ্ট চরিত্রের লোকের সাহায্যে বেপরোয়া হয়ে নিজেরাই সীমান্ত পার হবার চেষ্টা করবেন বলে ঠিক করলেন। সৌভাগ্যবশতঃ ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে টমাস সাহেব জানালেন যে জার্মান দূতাবাসে ভাল খবর এসেছে। নেতাজী যেন ইতালির দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আরও জানালেন যে তিন অক্ষশক্তি জার্মানি, ইতালি ও জাপান একসঙ্গে রুশ সরকারের কাছে অনুরোধ করেছে নেতাজীর রাশিয়ার ভেতর দিয়ে ইউরোপ যাবার ব্যবস্থায় যেন তারা সহায়তা করে। ইতালির রাষ্ট্রদূত কোয়ারোনির সঙ্গে নেতাজী অতি গোপনে মিলিত হলেন ও তাদের কথাবার্তা খুবই

ফলপ্রসূ হল। কোয়ারোনি রোমে তাঁর সরকারের কাছে নেতাজীর সঙ্গে কথাবার্তার ভিত্তিতে খুবই ভাল রিপোর্ট পাঠালেন। তারপর ঠিক হল কোয়ারোনির স্ত্রী ও ভগতরাম উত্তমচাঁদের দোকানে এসে খবরাখবর বিনিময় করবেন। অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেয়ে নেতাজী কাবুলে ভবিষ্যতের বিপ্লবাত্মক কার্য্যকলাপের জন্য নির্ভরযোগ্য লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা চালালেন।

কাবুল ছাড়বার দিন সাতেক আগে ইতালির দূতাবাসের ক্রেশিনি নেতাজীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে তাঁর ছবি তোলালেন। উত্তমচাঁদ নেতাজীর জন্য নতুন ইউরোপীয় পোশাকের ব্যবস্থা করলেন। ইতালির দূতাবাসের এক কর্মী অরল্যাণ্ডো মাৎসোতার পাশপোর্টে নেতাজীর ছবি সেঁটে দেওয়া হল। ১৭ মার্চ ক্রেশিনির বাড়িতে নেতাজী চলে গেলেন এবং সেখানেই রাত কাটালেন। ১৮ মার্চ ভোর রাতে একটি বড় মোটর গাড়িতে নেতাজী আফগান রুশ সীমান্তের দিকে রওনা দিলেন। সঙ্গে গেলেন একজন জার্মান ইঞ্জিনিয়র ওয়েনগার। রইলেন আরও একজন জার্মান হিলপার্ট, একজন ইতালিয়ান ও গাড়ির জার্মান ড্রাইভার। সীমান্ত পার হয়ে তিনি জার্মান সাথীদের সঙ্গে অরল্যাণ্ডো মাৎসোতার ছদ্মনামে ট্রেনে মস্কো গেলেন। ৩১ মার্চ মস্কোর জার্মান রাষ্ট্রদূত বার্লিনের সদর দপ্তরে জানালেন নেতাজী মস্কো পৌঁছে গেছেন।

২ এপ্রিল বিমানে তিনি বার্লিন পৌঁছোলেন। সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে নেতাজীর যোগাযোগের কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য অবশ্য নেই। জার্মানি, ইতালি ও জাপানের সঙ্গে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্কের খাতিরে রুশ সরকার সম্ভবত নেতাজীকে ইতালিয়ান পাশপোর্ট নিয়ে রাশিয়ার মধ্যে দিয়ে জার্মানি যাত্রায় আপত্তি করেন নি।

পঞ্চম পর্ব

জার্মানি পৌঁছে নেতাজী খুব বড় রকমের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রবক্তা হিসাবে তিনি একেবারে একা। অন্য দিকে জার্মানি তখন একটার পর একটা দেশ জয় করে সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া সারা ইউরোপ নিজের দখলে এনেছে। জার্মানির নেতাদের লক্ষ্য ছিল ইউরোপের সর্বময় কর্তা হওয়া। ফ্রান্সকে পরাজিত করে এবং ইংরাজদের ইউরোপ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে তখন কোনও বাধা ছিল না। বিশ্বজোড়া ইংরাজ সাম্রাজ্য অটুট থাকলেও যদি ইংরাজ ইউরোপে জার্মানির কর্তৃত্ব মেনে নেয় তাতেই তারা খুশি। নেতাজীর প্রাথমিক কাজ হল জার্মানদের বোঝানো যে ইংরাজ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ থেকে ইংরাজদের আধিপত্য দূর করতে পারলেই ইংরাজদের পুরোপুরি হারানো সম্ভব। সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করলে জার্মানদেরই লাভ। বার্লিনে পৌঁছোনোর সাতদিন পরেই নেতাজী পরিষ্কার করে লিখে জার্মানি ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রগুলি তুলে ধরে জার্মান সরকারের কাছে প্রস্তাব দিলেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে উপজাতিদের এলাকা, সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব ছিল। ঐ সব এলাকার অধিবাসীরা লড়াকু এবং বন্দুক চালাতে পটু। জার্মান সরকার নেতাজীকে ব্যক্তিগতভাবে স্বাগত জানালেও নেতাজীর পরিকল্পনা তাঁদের পক্ষে গ্রহণ করা সহজ ছিল না। প্রথমত, ভারত ও এশিয়ার দেশগুলির রাজনীতি ও মুক্তি সংগ্রামের কথা তারা কিছুই জানত না, দ্বিতীয়ত,

জার্মানির একচ্ছত্র নেতা হিটলার মোটেই ভারত ও প্রাচ্যের দেশগুলির স্বাধীনতার আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। ঐ সময় জাপানীদের মারফৎ পাঠানো এক গোপন বার্তায় নেতাজী শরৎচন্দ্র বসুকে জানিয়েছিলেন যে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ তাঁকে বলেছেন যে নেতাজী যেন তাঁকে এবং তাঁর মন্ত্রককে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অবহিত করার ভার নেন। সৌভাগ্যবশত, পররাষ্ট্র মন্ত্রকে যে বিশেষ ভারত দপ্তর খোলা হয়, তার ভারপ্রাপ্ত অ্যাডাম ফল ট্রট ও তাঁর সহকারী আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ নেতাজী ও আমাদের দেশের প্রতি খুবই বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। তা সত্ত্বেও নেতাজীর শর্তে জার্মানদের রাজী করাতে দীর্ঘ ছয় মাস লেগে গেল।

১৯৪১-এর নভেম্বর মাসে নেতাজী জার্মান সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে সমর্থ হলেন। তাঁর প্রাথমিক আর্জি ছিল ঃ

(১) স্বাধীন ভারত সংস্থা বা ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার গঠন

(২) স্বাধীনভাবে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বেতারে প্রচারের ব্যবস্থা

(৩) জার্মানিতে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের গোড়াপত্তন।

জার্মানি পৌঁছোবার পরই নেতাজী তাঁর পত্নী এমিলিয়ে শেঙ্কলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তারপর একে একে জার্মানি ও ইউরোপ প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁদের মুক্তিযুদ্ধে সামিল করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন এ. সি. এন. নাম্বিয়ার, আবিদ হাসান, এন. জি. গণপুলে, এন. জি. স্বামী, মুকুন্দ ব্যাস, গিরিজা মুখার্জী প্রমুখ। নভেম্বর মাসের প্রথমেই বার্লিনে নেতাজী একটি সভা ডাকেন এবং স্বাধীন ভারত সংস্থা বা ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মান সরকার এই সংস্থাকে পুরোপুরি এক স্বাধীন রাষ্ট্রের দূতাবাসের মর্যাদা দেয়। বেতারে প্রচারের

কাজটি শীঘ্রই হাতে নেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রচারের ব্যবস্থা হয়। ঠিক হয় আজাদ হিন্দ রেডিও নামে এই প্রচার পুরোপুরি নেতাজীর নেতৃত্বে ভারতীয়দের হাতে থাকবে। দুটি ভাষায় প্রথমে প্রচার শুরু হলেও ধীরে ধীরে ভারতের সবকটি ভাষায় প্রোগ্রাম চলতে থাকে। তৃতীয় কাজটি ছিল খুবই কষ্টসাধ্য—ভারতের মুক্তি সংগ্রামে ভারতীয় নেতৃত্বে সত্যিকারের একটি ফৌজ গঠন করা।

নেতাজী যখন বার্লিন ও রোমে জার্মান ও ইটালির সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন, জুন মাসের শেষে জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করে নেতাজীর সব পরিকল্পনাই গোলমাল করে দিল। নেতাজী জার্মানিকে তাঁর গভীর অসন্তোষের কথা জানালেন। তিনি জানতেন যে তাঁর পরিকল্পনার সম্পূর্ণ সাফল্য নির্ভর করছিল জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে শান্তি বজায় থাকার উপর। যাই হোক নেতাজী কোনও অবস্থাতে হার মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইউরোপে প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে গেলেন। অন্যদিকে জার্মানরা রাশিয়ার গভীরে প্রবেশ করার পর মনে করল যে ভারতের সীমান্তের খানিকটা কাছে আসার ফলে নেতাজীকে কাজের সুযোগ ও সুবিধা করে দিলে তাদের লাভ বৈ ক্ষতি নেই।

স্বাধীন ভারত সংস্থা তার কাজ শুরু করার পরই কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেগুলি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। প্রথম, আমাদের জাতীয় অভিবাদন হবে 'জয় হিন্দ', দ্বিতীয়, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হবে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ-মন অধিনায়ক জয় হে', তৃতীয়, সুভাষচন্দ্রের উপাধি হবে 'নেতাজী', চতুর্থ, আমাদের জাতীয় ভাষা হবে রোমান

হরফে লেখা হিন্দী ও উর্দু-তে মিশিয়ে 'হিন্দুস্থানি', যে ভাষা দেশের অধিকাংশ লোক সহজে বুঝতে পারে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের জন্য নেতাজী ১৯৪১-এর ডিসেম্বর মাসে আনাবুর্গ শহরে জার্মানদের হাতে বন্দী ইংরাজদের ভারতীয় ফৌজের একদল অফিসার ও সেপাইদের সঙ্গে মিলিত হলেন। ইংরাজদের ভারতীয় ফৌজ ছিল আসলে একটি ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী। দেশের জনগণের দেওয়া করের অর্ধেকটাই ইংরাজ সরকার ঐ সৈন্যবাহিনীর জন্য খরচ করত এবং দেশের বাইরে ও ভিতরে যখনই প্রয়োজন হত সাম্রাজ্যের স্বার্থে এদের ব্যবহার করত। তাদের ইংলণ্ডের রাজার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হতো। দেশের প্রতি তাদের কোনও আনুগত্য ছিল না এবং রাজার নামে শপথ যেন তাদের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। নেতাজী এদের দেশের কথা, স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা, দেশের প্রতি তাদের কর্তব্যের কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন। অফিসারদের মধ্যে তেমন কোনও সাড়া না পাওয়া গেলেও ধীরে ধীরে সাধারণ সিপাহীদের মধ্যে পরিবর্তন এল। প্রথমে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বেছে নিয়ে ফ্র্যাঙ্কেনবুর্গ শহরে ট্রেনিং-এ পাঠানো হল। জার্মানিতে যে কয়েকজন ছাত্র ছিলে তাদের মধ্য থেকে এবং ইংরাজদের ফৌজ থেকে আগ্রহী ১৫ জনকে বিশেষ ট্রেনিং-এর জন্য বেছে নেওয়া হল। নেতাজী একটার পর একটা যুদ্ধ শিবিরে গিয়ে বক্তৃতা করে প্রচার চালিয়ে গেলেন। কিন্তু কোনও রকম জোর জবরদস্তি করেন নি। যারা অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে এল তাদের ট্রেনিং দিয়ে ফৌজ গঠনের কাজ এগিয়ে নিলেন। এক বছরে সাড়ে তিন হাজার অফিসার ও সৈন্যদের নিয়ে ভারতের বাইরে প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি হয়ে গেল। নেতাজী তাঁর কর্মব্যস্ততার মধ্যেও

প্রায়ই ফৌজী শিবিরে গিয়ে তাদের উৎসাহ দিতেন। জার্মান সরকারের সঙ্গে তাঁর কথা ছিল যে আজাদ হিন্দ ফৌজ রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোনও লড়াইয়ে অংশ নেবে না। ট্রেনিং শেষ হবার পর যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। প্রথমে হল্যাণ্ডের উপকূলে ও পরে ফ্রান্সের আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরে প্রতিরক্ষা লাইনে তাদের পাঠানো হয় এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্য্যকলাপ খুবই প্রশংসা পায়।

১৯৪৩-এর জানুয়ারির শেষের দিকে নেতাজী কোয়েনিগস্‌ব্রুক শহরে তাঁর ফৌজের সঙ্গে শেষবার মিলিত হন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বলেছেন যে নেতাজীর সেদিনের বক্তৃতা ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতার একটি। সৈন্যরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। তারপর যুদ্ধের গতি পালটে যাওয়াতে আজাদ হিন্দ ফৌজ পশ্চিম ফ্রণ্টে যখন খুবই বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে তখন তারা অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে দেশের ও নেতাজীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখে।

যখন ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে ইউরোপে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা পর্ব সম্পূর্ণ, তখনই সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। জাপান আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জলে স্থলে ও আকাশে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে এবং বিদ্যুৎ গতিতে জাপানীরা ইংরাজ ও আমেরিকানদের ঘাঁটির পর ঘাঁটি দখল করে নেয়। ১৯৪২-এর জানুয়ারি মাসের মধ্যেই মালয় থেকে তারা ইংরাজ ফৌজকে হটিয়ে দিতে আরম্ভ করে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এশিয়ার যুদ্ধে জাপানীদের বিপুল জয় এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল। নেতাজী এই নতুন পরিস্থিতিতে এক বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পেলেন এবং

১৯৪২-এর প্রথম থেকেই ইউরোপ ছেড়ে পূর্ব এশিয়ায় চলে আসার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। শীঘ্রই জার্মান ও জাপান সরকারের উচ্চতম মহলে তিনি এ বিষয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। মে মাসের শেষে হিটলারের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। নানা বিষয়ে তীব্র মতভেদ হলেও তাঁকে এশিয়া যাত্রায় সাহায্য করতে হিটলার রাজী হলেন এবং ডুবো জাহাজে তাঁর যাত্রার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে যুদ্ধ দপ্তরকে নির্দেশ দিলেন।

১৯৪৪-এর মাঝামাঝি আমেরিকানরা বিপুল সমর-সম্ভার নিয়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের উপকূলে নামে এবং জার্মানদের দুই ফ্রণ্টে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে। ফলে জার্মানদের বিপর্য্যয়ের পালা শুরু হয়। পশ্চিম ফ্রণ্টের উপকূলে আজাদ হিন্দ ফৌজ জার্মানদের সঙ্গে সঙ্গে পিছু হটতে থাকে। অনেকেই যুদ্ধে প্রাণ হারান এবং অন্যরা বিজয়ী পক্ষের হাতে ১৯৪৪-৪৫এ যুদ্ধবন্দী হন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা দেশের ও নেতাজীর সম্মান অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর ইউরোপের আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেককে বন্দী করে ভারতে এনে দিল্লির লালকেল্লায় রাখা হয়। সেখানে তাঁরা পূর্ব এশিয়ার আজাদি অফিসার ও সিপাহিদের সঙ্গে মিলিত হন।

১৯৪১ থেকে ১৯৪৫-এর এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষে নেতাজীর সঙ্গে জার্মানদের যে চুক্তি হয়েছিল, সেটা দুই পক্ষই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। একদিনের জন্যও কোনও কাজ থেমে থাকে নি। কিন্তু একটা মূল প্রশ্নে নেতাজী হিটলারকে রাজী করাতে পারেন নি। নেতাজী দাবি করেছিলেন যে জার্মানি, ইটালি ও জাপান যুক্তভাবে একটি ঘোষণা করুক যে তারা যুদ্ধের শেষে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবে। ইতালি ও জাপান রাজী হলেও হিটলার বলেন যে

যতক্ষণ না বিশ্বযুদ্ধ ভারতের সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে ততক্ষণ ঐ ঘোষণা অবাস্তব।

জাপানী ফৌজ ১৯৪২-এর প্রথমেই মালয়, সিঙ্গাপুর ও শেষ পর্যন্ত বর্মা দখল করে নেওয়ার পর নেতাজীর মন আর ইউরোপে টিকছিল না। এশিয়া চলে আসার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৪২-এর জুন মাসে থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্কক শহরে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগ্রামী ভারতীয়দের এক সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলন থেকে নেতাজীকে পূর্ব এশিয়ায় এসে মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব হাতে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে ইউরোপ থেকে পূর্ব এশিয়ায় আসা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ কারণ স্থলে ও সমুদ্রে ছিল আমেরিকান ও ইংরাজদের সম্পূর্ণ আধিপত্য। যাই হোক প্রায় ৮-৯ মাস ধরে জার্মান ও জাপানী সমর দপ্তরের মধ্যে গোপন আলোচনার পর নেতাজীকে ডুবো জাহাজে করে এই দীর্ঘ বিপদ-সঙ্কুল পথে এশিয়ায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়।

১৯৪৩-এর ২৬ জানুয়ারি ভারতের স্বাধীনতা দিবসে বার্লিনে এক মহতী সভায় নেতাজী এক ঐতিহাসিক বক্তৃতা দেন। তারপর তাঁকে আর জার্মানিতে দেখা যায় নি।

ষষ্ঠ পর্ব

১৯৪৩-এর ৯ ফেব্রুয়ারি ভোরে উত্তর জার্মানির কীল বন্দর থেকে একটি ডুবো জাহাজ নেতাজী ও আবিদ হাসানকে নিয়ে যাত্রা করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে অতি গোপনে পরিকল্পিত দুঃসাহসিক ও বিপদসঙ্কুল এই যাত্রা নজিরবিহীন। রওনা হবার আগে নেতাজী মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুকে বাংলায় একটি চিঠি লিখে রেখে গেলেন, যাতে লেখা ছিল যে তিনি আরও একবার বিপদের পথে যাত্রা করছেন। হয়ত বা পথের শেষ আর দেখবেন না তিনি, তাঁর অবর্তমানে মেজদাদা যেন তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে স্নেহ দেখান, যেমন সারা জীবন তাঁকে করেছেন।

জার্মান ও জাপানি যুদ্ধ দপ্তর যুক্তভাবে এই জলযাত্রার পরিকল্পনাটি করেছিলেন। ঠিক ছিল জার্মান ডুবোজাহাজটি নেতাজীকে ভারত মহাসাগরের নির্দিষ্ট একটি স্থানে পৌঁছে দেবে। অন্যদিক থেকে একটি জাপানী ডুবো জাহাজ তাঁকে তুলে নিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি বন্দরে নামিয়ে দেবে। কীল থেকে ইংলণ্ডের উত্তর দিয়ে ঘুরে ডুবোজাহাজটি আটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আফ্রিকার দক্ষিণ কূলের পাশ কাটিয়ে ভারত মহাসাগরে ঢুকল। ২৪ এপ্রিল ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের দক্ষিণ পূর্বে জার্মান ও জাপানি ডুবোজাহাজ কাছাকাছি হল। কিন্তু আবহাওয়া খুবই খারাপ ছিল। সমুদ্র উত্তাল। যাত্রীদের জাপানি জাহাজে স্থানান্তরিত করা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্য্যন্ত একটি রবারের ছোট নৌকা জলে নামিয়ে মাথার উপর দিয়ে এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজ পর্য্যন্ত দড়ি টাঙ্গিয়ে অতি কষ্টে নেতাজী ও আবিদ হাসানকে জাপানি ডুবোজাহাজে তোলা হল। ৬ই মে তাঁরা



সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরে সাবাং বন্দরে পৌঁছোলেন।

নেতাজীকে জার্মান কর্তৃপক্ষ বলেই দিয়েছিলেন যে এই বিপদসঙ্কুল যাত্রা তাঁকে নিজের দায়িত্বে করতে হবে এবং নেতাজী আনন্দের সঙ্গেই তা মেনে নিয়েছিলেন। ৯০ দিনের ডুবোজাহাজের এই যাত্রায় কষ্টের সীমা ছিল না। কিন্তু সবকিছু অগ্রাহ্য করে নেতাজী সারা সময়টাই কর্মব্যস্ত ছিলেন। পূর্ব এশিয়ায় পৌঁছানোর পর তিনি কিভাবে মুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলবেন, তার প্রতিটি দিক থেকে চিন্তাভাবনা করে নিজের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করেছিলেন। একদিন ঝাঁসির রানীর বাহিনী সম্বন্ধে হাসানকে প্ল্যানটি বলছিলেন এবং হাসান লিখছিলেন। সেই সময় একটি শত্রু জাহাজ ডুবোজাহাজটিকে দেখতে পেয়ে তীব্র গতিতে এগিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে সেটিকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে। একটুর জন্য নেতাজী ও তাঁর সাথীরা সলিল সমাধি থেকে রক্ষা পান। মৃত্যুভয়ে হাসান ও

আর সকলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। নেতাজী অবিচলিত গলায় হাসানকে বললেন—‘দেখ, আমি দুবার একই কথা তোমাকে বললাম, কিন্তু তুমি লিখলে না।’ ডুবোজাহাজের অধিনায়ক মুসেনবার্গ সব নাবিকদের ডেকে বললেন যে বিপদের মুখে কিভাবে স্থির ও ভয়হীন থাকা যায় তোমরা আমাদের সম্মানিত অতিথির কাছে সেটা শেখো।

সাবাং-এ কয়েকদিন বিশ্রাম করে আর একটি বিমানে নেতাজী ও হাসান টোকিও পৌঁছলেন। পুরো একমাস ধরে নেতাজী ও জাপানি প্রধানমন্ত্রী তোজোর মধ্যে শিখর সম্মেলনের প্রস্তুতি চলল। সময়টা নেতাজী খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কাটালেন। একদিকে তিনি জাপানের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদ ও সমরনায়কদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। অন্যদিকে জাপানে যে-সব ভারতীয় নাগরিক ছিলেন এবং যাঁরা ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লীগের ও রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। জাপানী সরকার তাঁকে কলকারখানা, খামার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও নানা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ঘুরিয়ে দেখালেন, যাতে তিনি জাপানের জনজীবন সমন্ধে একটি সম্পূর্ণ ধারণা করতে পারেন।

জুন মাসের মাঝামাছি তোজোর সঙ্গে নেতাজীর প্রথম দেখা হল। এর আগে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে জাপানী সরকারের ভাল বোঝাপড়া হচ্ছিল না। তার কারণ যোগ্য নেতৃত্ব ও বিশ্বরাজনীতিতে যে কৌশল ও কূটনীতির প্রয়োজন হয় তার অভাব। তাই নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের ফল সম্বন্ধে তোজোর সংশয় ছিল। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই নেতাজী তোজোর মন জয় করে নিলেন। নেতাজীর ব্যক্তিত্বে

তোজো এমনই প্রভাবিত হলেন যে তাঁর সব মূল দাবিগুলোই মেনে নিলেন। দুইদিন কথাবার্তার পর তোজো নেতাজীকে আগামী পার্লামেন্টের এক অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানালেন। নেতাজীর উপস্থিতিতে তোজো ঘোষণা করলেন যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার জাপান মেনে নিচ্ছে এবং স্বাধীনতার যুদ্ধে সবরকম সহযোগিতা জাপান দেবে। নেতাজী জার্মান সরকারের কাছ থেকে এই ধরণের ঘোষণা আদায় করতে পারেন নি। দেশের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী ও জাতীয় কংগ্রেস নেতারা যুদ্ধের সংকটময় মুহূর্তেও ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে এই আশ্বাস আদায় করতে পারেন নি যে যুদ্ধশেষে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করে নেওয়া হবে। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সারা জগতকে স্তম্ভিত করে জাপানী বেতারে ঘোষণা করা হল যে নেতাজী টোকিওতে পৌঁছে গেছেন। তার পরেই দেশবাসীদের ও পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে নেতাজী বেতারে বক্তৃতা করলেন। জাপান থেকে আরম্ভ করে সারা পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। ১৯৪৩-এর ৩ জুলাই রাসবিহারী বসুর সঙ্গে নেতাজী সিঙ্গাপুর বিমান বন্দরে নামলেন। ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লীগের নেতৃবৃন্দ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের উচ্চপদস্থ অফিসাররা তাঁকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানালেন।

পূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের ইতিহাস খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি জাপানের সমর দপ্তরের গুপ্ত বিভাগের টামুরা ও পরে ফুজিয়ারার সঙ্গে ব্যাঙ্ককে ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লীগের অমর সিং ও প্রীতম সিং-এর যোগাযোগ হয়। ঐ কয়েকটি আদর্শবাদী ব্যক্তিদের বন্ধুত্বের মধ্য দিয়েই যুদ্ধের সময় ভারত-জাপান মৈত্রীর শুরু। ১৯৪১-এর

প্রথম সপ্তাহে জাপান ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর ঘটনাপ্রবাহ অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। কয়েকদিনের মধ্যেই ইংরাজদের নৌবাহিনী পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় এবং জাপানী ফৌজ থাইল্যাণ্ড ও মালয়ে ক্ষিপ্রগতিতে এগোতে থাকে। ফৌজের সঙ্গে সঙ্গে ফুজিয়ারা ও প্রীতম সিং মালয়ে প্রবেশ করেন। মালয়ের উত্তর-পশ্চিমে জিত্রা ফ্রন্টে ইংরাজ বাহিনী জাপানী ফৌজের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং ইংরাজ সেনাপতি আত্মসমর্পন করেন। জাপানীরা ঐ ফ্রন্টে আলোর স্টার শহর দখল করে ঘাঁটি গেড়ে বসে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হয়। পরাজিত ইংরাজ বাহিনীতে ছিলেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং। প্রীতম ও ফুজিয়ারার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়। ২০শে ডিসেম্বর ফুজিয়ারা জাপানী বাহিনীর অধিনায়ক ইয়ামাসিটা-র সঙ্গে মোহন সিং-এর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। ইয়ামাসিটা-র সঙ্গে কথা বলে মোহন সিং খুবই অভিভূত হন ও বলেন, কোনও ইংরাজ সেনাপতি এত আন্তরিকতার সঙ্গে ও খোলাখুলিভাবে কোন বিদেশী জুনিয়র অফিসারের সঙ্গে কথা বলবেন, তা ভাবাই যায় না। ইয়ামাসিটা মোহনকে আশ্বাস দেন যে জাপানী ফৌজ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। অনেক ভেবেচিন্তে মোহন সিং বছরের শেষের দিন প্রীতম ও ফুজিয়ারাকে জানান যে তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গঠন করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রথম থেকেই অবশ্য তাঁরা সকলেই এই আশা ব্যক্ত করেন যে নেতাজীর মত একজন প্রথম সারির বিপ্লবী নায়ক পূর্ব এশিয়ায় এসে নেতৃত্বের ভার নিলে তাঁদের লড়াই জয়যুক্ত হবেই।

মালয় ও সিঙ্গাপুরের যুদ্ধে ইংরাজদের শোচনীয় পরাজয়

ঘটল। ১৯৪২-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরের পতন হয়। ১৭ সিঙ্গাপুরের ফারার পার্কে ৫০ হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের আলাদা করে সমবেত করে ইংরাজ অফিসার হাণ্ট তাদের জাপানী প্রতিনিধি ফুজিয়ারার হাতে তুলে দিলেন। ফুজিয়ারা বললেন যে জাপান ভারতীয়দের শত্রু বলে মনে করে না। তারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করলে জাপান যথাসাধ্য সাহায্য করবে। মোহন সিং ঐ সভায় জোরালো বক্তৃতা করে যুদ্ধবন্দীদের স্বাধীনতার লড়াইয়ে যোগ দিতে আহ্বান করেন। আই-এন-এ গঠনের জন্য ভলাণ্টিয়ার হিসাবে নাম লেখাতে বলাতে সমবেত যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশী রাজার প্রতি আনুগত্য বর্জন করে দেশ ও স্বাধীনতার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিল।

১৯৪২-এর মার্চ মাসে ভারতীয় এক প্রতিনিধি দল টোকিও গেলেন জাপান সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। প্রাথমিক কথাবার্তা সন্তোষজনক হল। জুন মাসে রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের প্রতিনিধিদের নিয়ে ব্যাঙ্ককে একটি বড় সম্মেলন ডাকা হয়। সম্মেলনে ভারতীয়দের তরফ থেকে অনেকগুলো দাবি প্রস্তাবের আকারে জাপানীদের দেওয়া হয়। জাপান তখন প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিরাট ফ্রণ্টে জলে, স্থলে ও আকাশে ইংরাজ ও আমেরিকানদের সঙ্গে তীব্র যুদ্ধে লিপ্ত। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে জাপানীরা তাদের সমর্থনের কথা আগেই খোলাখুলিভাবে বলে দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী তোজো বেতারে এই মর্মে ঘোষণাও করেছিলেন। ব্যাঙ্ককে সম্মেলনের প্রস্তাবে যে সব খুঁটিনাটি প্রশ্ন তোলা হয়েছিল সেগুলি বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে আসতে দেরি হচ্ছিল।

মাস দুই-তিন ট্রেনিং-এর পর ১৯৪২-এর অগাস্ট মাসে I.N.A. গঠন করা হল। ঠিক সেই সময় দেশের ভিতরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। মহাত্মা গান্ধী 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। দেশের ভিতরে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলন খুবই জোরদার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সরকারের কঠোর ও নিষ্ঠুর দমননীতির ফলে গণ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এল। পূর্ব এশিয়ায় রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান ইনডিপেণ্ডেন্স লীগ ও মোহন সিং-এর নেতৃত্বে আই.এন.এ.-র মধ্যে ভাল বোঝাপড়া গড়ে ওঠে নি। জাপানী অফিসারদের সঙ্গেও নানা মতভেদ দেখা দিচ্ছিল। তার উপর বর্মার রণাঙ্গন থেকে ইংরাজদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করার অভিযোগে মোহন সিং-এর এক ঘনিষ্ঠ সহায়ক ধরা পড়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। মোহন সিং রাসবিহারী বসুর সঙ্গে আলোচনা না করেই আই. এন. এ. ভেঙ্গে দিলেন। রাসবিহারী বসু মোহন সিং-এর একতরফা সিদ্ধান্ত মানতে রাজী হলেন না। কয়েকজন বিশ্বস্ত সহযোগী ও সামরিক অফিসারের সাহায্যে বেসামরিক ও সামরিক সংগঠনের কাঠামো বজায় রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন তিনি। ইতিমধ্যে সকলেই জানতে পেরেছেন যে জাপানী সরকার সুভাষচন্দ্র বসুকে পূর্ব-এশিয়ায় নিয়ে আসার জন্য জার্মান সরকারের সঙ্গে যুক্তভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। সকলেরই আশা নেতাজী পূর্ব-এশিয়ায় এসে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে আসীন হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। জাপান সরকারের সঙ্গে সমান সমানে কথা বলার মত নেতা পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন না। নেতাজী সেই স্থান পূর্ণ করবেন বলে সকলেই সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

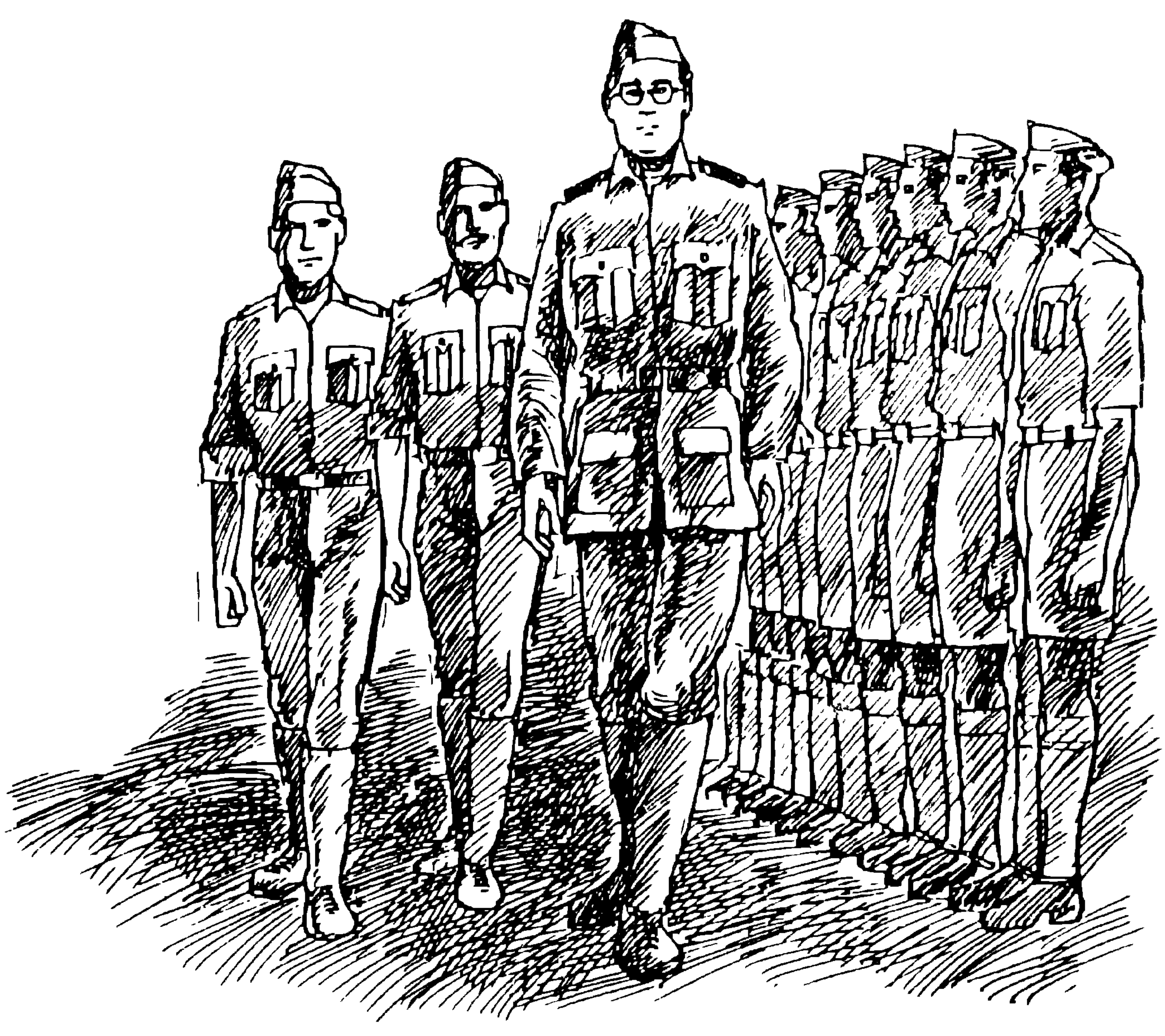
১৯৪৩-এর জুনের শেষে নেতাজী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে প্রথম ভাষণ দিলেন সেটা পূর্ব-এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করল। নেতাজী বললেন : 'আমাদের দেশবাসীরা ও দেশে আমাদের ভাইবোনেরা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যথাসাধ্য করছেন। কিন্তু আমাদের শত্রু নির্মম ও বেপরোয়া এবং অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান। এই রকম এক নিষ্ঠুর শত্রুর বিরুদ্ধে যতই আইন অমান্য বা বয়কট বা বিক্ষিপ্ত সশস্ত্র আক্রমণ করা যাক না কেন, কোনও ফলই হবে না...শত্রু ইতিমধ্যেই অস্ত্রধারণ করেছে। সুতরাং তার সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু দেশের ভিতরে আমাদের দেশবাসীদের পক্ষে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত করা এবং দখলদারী ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই কাজ দেশের বাইরে যে সকল ভারতীয় আছেন, বিশেষ করে পূর্ব-এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দেরই করতে হবে...সময় এসে গেছে! প্রত্যেকটি দেশপ্রেমী ভারতবাসীকে আজ যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগোতে হবে। যখন দেশপ্রেমী ভারতীয়দের রক্ত বইতে আরম্ভ করবে, সে দিনই ভারত স্বাধীন হবে।'

সপ্তম পর্ব

১৯৪৩-এর ৪ জুলাই সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমা হলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সব দেশের ইণ্ডিপেনডেন্স লীগ বা আজাদ হিন্দ সংঘের প্রতিনিধিরা এক বিরাট সভায় মিলিত হলেন। ঐ সভায় রাসবিহারী বসু এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় লীগের সভাপতিপদ থেকে ইস্তফা দিলেন এবং নেতাজীকে সভাপতির পদ গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন। স্বেচ্ছায় কনিষ্ঠের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিয়ে রাসবিহারী রাজনীতিতে এক বিরল ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। বিনম্রভাবে নেতৃত্ব গ্রহণ করে নেতাজী এক দীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। সমবেত প্রতিনিধিরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর কথা শুনলেন। নেতাজী বললেন দেশপ্রেমিক সব ভারতীয়দের সক্রিয়ভাবে মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে সকলের আগে চাই অনুশাসন এবং এক সবল নেতৃত্ব। সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি বিশ্বের নানা রাষ্ট্রের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে পারে, তবে স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের ইংরাজদের শত্রুদের কাছে সাহায্য ও সমর্থন চাইতে আপত্তি থাকতে পারে না। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে দেশের জনগণ অহিংস সহযোগ থেকে সক্রিয় প্রতিরোধের পথে এগিয়েছেন। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের কর্তব্য আরও এগিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যাওয়া। তিনি আরও বললেন যে এক সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার জন্য তিনি স্বাধীন ভারতের এক অস্থায়ী সরকার গঠন করতে চান। স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতীয় জনগণ তাদের ইচ্ছামত সরকার গঠন করবে। তিনি পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের বলেন, তাঁরা যেন ভেবেচিন্তে নিজ ইচ্ছায় লড়াই-এ

সামিল হন। মুক্তির লড়াইয়ের ঐ চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁদের ভাগ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অশেষ কষ্ট, দীর্ঘ ও দুর্গম পথে ক্লান্তিকর মার্চ ও শেষে মৃত্যু ছাড়া কিছুই জুটবে না। তবে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে স্বাধীনতা আসবেই আসবে। নেতাজী পূর্ব এশিয়ার ভারতবাসীদের কাছ থেকে চাইলেন 'সর্বাত্মক উদ্যোগ' (টোটাল মোবিলাইজেশন্) পুরুষ, নারী, বৃদ্ধ, যুবা, ধনী, দরিদ্র এমনকি বালক-বালিকারা পর্য্যন্ত যার যা কিছু আছে স্বাধীনতার যুদ্ধে দান করবে।

পরের দিন ৫ জুলাই সিঙ্গাপুরের সমুদ্রের তীরে টাউন হলের সামনে বিস্তীর্ণ ময়দানে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করলেন এবং অভিবাদন নিলেন। সৌভাগ্য-বশতঃ রাসবিহারী বসু ও জগন্নাথ রাও ভোঁসলে ও মহম্মদ জামান কিয়াসির মত অফিসাররা মোহন সিং-এর কথা না শুনে ফৌজের



কাঠামোটি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। ঐ দিন প্রথম নেতাজীকে সর্বাধিনায়কের সামরিক পোষাকে দেখা গেল। নেতাজীর সেদিনকার বক্তৃতা ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। নেতাজী বললেন 'আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবের দিন। ঈশ্বরের কৃপায় আজ আমি সারা জগতের সামনে ঘোষণা করছি যে ভারতের মুক্তি ফৌজ এক বাস্তব সত্য।' তিনি আরও বললেন যে আমাদের মুক্তি যুদ্ধে একটি জিনিসেরই অভাব ছিল—এক মুক্তি ফৌজ। সেই অভাব আজ পূর্ণ হল। আমাদের ফৌজ দেশের ইতিহাসে এক নতুন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করবে। নেতাজী তাঁর সৈনিকদের আশ্বাস দিয়ে বলেন যে তিনি সব সময়ই তাদের পাশে থাকবেন অন্ধকারে ও আলোকে, দুঃখে ও আনন্দে, বিপর্যয়ে ও বিজয়ে। তিনি আরও বললেন 'এই যুদ্ধে আমাদের মধ্যে কে বাঁচবে কে মরবে তাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা হল ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে।'

৬ জুলাই আরও একটি কুচকাওয়াজে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো নেতাজীর পাশে দাঁড়িয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজ দেখলেন এবং খুবই উৎসাহিত হলেন।

প্রাথমিক দুটি বড় কাজ সম্পন্ন করে নেতাজী পূর্ব-এশিয়ায় এক ঝটিকা সফরে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর সফরের ফলে ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেম, দেশসেবা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা দেখা দিল। হাজারে হাজারে পুরুষ ও নারী, যুবক ও বৃদ্ধ এমনকি বালক-বালিকারাও আজাদ হিন্দ আন্দোলনের শরিক হল।

১৯৪৩-এর ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকার ঘোষণা করলেন। ঘোষণাপত্রটি আগের দিন সারারাত

জেগে তিনি লিখেছিলেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এর মত মূল্যবান দলিল খুব কমই আছে। ১৭৫৭ সালে ইংরাজদের হাতে বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজৌদল্লার পরাজয় থেকে আরম্ভ করে দুশো বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, জয় ও পরাজয়ের কাহিনী বিবৃত করে বর্তমান বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ভারতের শেষ মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার প্রাক্কালে নেতাজী দেশবাসীকে আজাদ হিন্দ সরকারের পতাকার তলায় সমবেত হয়ে শত্রুকে চরম আঘাত হানবার প্রস্তুতি নিতে বললেন। অস্থায়ী স্বাধীন সরকারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হলেন নেতাজী। এ. সি. চ্যাটার্জি হলেন অর্থমন্ত্রী. এস. এ. আয়ার প্রচারমন্ত্রী এবং লক্ষ্মী স্বামীনাথন নারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। তাছাড়া ৮ জন সামরিক অফিসার মন্ত্রীসভায় আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিনিধিরূপে রইলেন। রাসবিহারী বসু হলেন প্রধান উপদেষ্টা, আনন্দ মোহন সহায় সচিব। আরও ছয়জন উপদেষ্টা ও একজন আইন বিশেষজ্ঞ রইলেন। ভাবগম্ভীর পরিবেশে নেতাজী যখন শপথবাক্য পাঠ করালেন, ভাবাবেগ ও উত্তেজনায় বিরাট সভাটি ফেটে পড়ল। এই প্রথম ২০০ বছর গোলামির পর ভারতবাসী দৃপ্তকণ্ঠে জগতের কাছে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করল।

পরের দিনই ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করল। আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কারণ হল আমেরিকা অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে ভারতের মধ্যে ইংরাজদের সাহায্য করছিল।

দুদিন পরেই নেতাজী রাণী ঝাঁসি বাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে খুললেন। তিনি নারীদের জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে সমান অধিকার ও মর্যাদা দেবার কথা বলতেন। এবার তা কাজেও করে দেখালেন। মেয়েরাও পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ

মিলিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করতে পারে তা তিনি বাস্তব করে দিলেন। মন্ত্রীসভায় মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব দিয়ে দেশ শাসনে তাদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা ইতিমধ্যেই করে দিয়েছিলেন। ছোট বালক বালিকাদের জন্য বাল সেনা তৈরি হল। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নেতাজী ৫০ জন ১৪-১৫ বছরের ছেলেকে সামরিক শিক্ষার জন্য জাপানের বিশ্ববিখ্যাত রাজকীয় সামরিক অ্যাকাডেমিতে পাঠালেন। এককথায় বলা যায় তাঁর অনুপ্রেরণায় ও নেতৃত্বে সারা পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য এক বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু হল।

নেতাজীর রাজনৈতিক কৌশল ও কূটনৈতিক সাফল্যের আরও একটি পরিচয় পাওয়া গেল যখন জাপান সরকার কালবিলম্ব না করে আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দিল। যদিও হিটলার আগের বছর নেতাজীর রাজনৈতিক দাবিগুলো নিয়ে গড়িমসি করেছিলেন, জার্মান সরকার আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে দেরি করল না। প্রথম শ্রেণীর এই দুই শক্তি ছাড়াও আর যারা স্বীকৃতি দিল তারা হল ইটালি, বর্মা, থাইল্যাণ্ড, জাতীয়তাবাদী চীন, ফিলিপিন, মাঞ্চুরিয়া ও ক্রোয়েশিয়া।

১৯৪৩-এর নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এশীয় দেশগুলির নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন। টোকিওতে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনে নেতাজীও আমন্ত্রিত হলেন, কিন্তু নেতাজী বললেন যে তিনি সম্মেলনে যোগ দেবেন পরিদর্শক হিসাবে, কারণ যতদিন না ভারত স্বাধীন হচ্ছে ততদিন তিনি পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে ভারতের কোনও দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিতে চান না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে পরিদর্শক হিসাবে সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করলেও

নেতাজী তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বক্তৃতার জোরে সম্মেলনে অন্য সকলের চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করলেন। তাঁর ভাষণ শুনে অন্য দেশের নেতৃবৃন্দ এশিয়ার নবজাগরণের এক তরুণ ও নতুন দিশারী দেখতে পেলেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় সম্মেলনে যে পাঁচদফা ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হল, সেটি যুদ্ধোত্তর পঞ্চশীলের সূচনা করেছিল বলা যেতে পারে। সম্মেলনের শেষে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো ঘোষণা করলেন যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ সরকারকে হস্তান্তরিত করা হবে এবং আজাদ হিন্দ সরকারই স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঐ দ্বীপগুলির শাসনভার গ্রহণ করবে।

জাপান সফরের অসামান্য সাফল্যের পর নেতাজী চীন সফরে গেলেন। জাতীয়তাবাদী চীন সরকারের প্রধান ওয়াং-চাই ওয়ে নেতাজীকে রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মান দিলেন। নানকিং-এর কাছে চীনের রাষ্ট্রপিতা সুন-ইয়ৎ সেনের সমাধিতে নেতাজী শ্রদ্ধার্ঘ্য দিলেন। চীনে, বিশেষ করে সাংহাই-এ অনেক প্রবাসী ভারতীয় পাঞ্জাবী ছিলেন। তাঁরা নেতাজীর সম্মানে বিরাট সমাবেশ ও কুচকাওয়াজের আয়োজন করে দলে দলে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সংঘে যোগ দিলেন।

সফরের পর সিঙ্গাপুরে ফিরে নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে বর্মায় এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সশস্ত্র লড়াই শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতির কাজে হাত দিলেন। ১৯৪৩-এর আগস্ট মাসে রেঙ্গুনে বর্মার স্বাধীনতা ঘোষণার পর রাষ্ট্রপ্রধান বা ম'র সঙ্গে নেতাজীর অর্থপূর্ণ কথাবার্তা হয়েছিল। বা মও আজাদ হিন্দ ফৌজকে ও আজাদ হিন্দ সরকারকে বর্মায় সবরকম সুযোগ সুবিধা দিতে রাজি হয়েছিলেন। তাছাড়া বর্মার জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও ভাল রকমের বোঝাপড়ার দরকার ছিল।

১৯৪৩ সালের শেষ দুই দিন নেতাজী আজাদ হিন্দ-এর রাষ্ট্রপতি হিসাবে আন্দামান গেলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার গ্রহণ করলেন। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীন ভারতের প্রথম ভূখণ্ড হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত হল। নেতাজী কুখ্যাত সেলুলার জেল পরিদর্শন করলেন, যেখানে ইংরাজরা শত শত বিপ্লবীদের বন্দী করে রেখেছিল ও নির্যাতন করেছিল। ৩০ ডিসেম্বর পোর্ট ব্লেয়ারের জিমখানা ময়দানে নেতাজী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন এবং এক বিরাট জনসভায় দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে আন্দামানের নতুন নাম হবে 'শহীদ দ্বীপ' এবং নিকোবারের 'স্বরাজ দ্বীপ'। আজাদ হিন্দ ফৌজের বড় অফিসার মেজর জেনারেল লোগোনাদনকে আন্দামান-নিকোবারের মুখ্য কমিশনার নিয়োগ করা হল। ঐ দ্বীপগুলি ইংরাজদের গুপ্তচরে ভর্তি ছিল, যারা ক্রমাগতই ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম করত। সেজন্য আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিনিধির পক্ষে সব সামাল দিয়ে শাসন করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়েছিল।

অষ্টম পর্ব

আন্দামান থেকে ফিরেই নতুন বছরের প্রথমে নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকার ও ফৌজের সদর দপ্তর রেঙ্গুনে এগিয়ে নিয়ে এলেন। ১৯৪৪-এর ৬ জানুয়ারী রেঙ্গুন থেকে গান্ধীর উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ বেতার ভাষণ দিলেন। ঐ ভাষণে ১৯৪১-এ দেশত্যাগ করার পর থেকে তাঁর কার্য্যকলাপের এক বিশদ ব্যাখ্যা দিলেন। প্রথমেই তিনি বললেন যে-সব দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছে সেই সব দেশের লোকেরা মহাত্মা গান্ধীকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তুলনায় যারা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ধ্বজা তুলে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য লড়াই করছে, তারা কপট। তিনি বিশ্বাস করেন না যে ইংরাজেরা বিশেষ চাপে না পড়লে কোনদিন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি মেনে নেবে। সুতরাং সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া আর কোনও পথ নেই। জাপান সম্বন্ধে নেতাজী বলেন যে জাপানীদের মধ্যে একটি মানসিক বিপ্লব ঘটে গেছে, তাদের মধ্যে এক নতুন 'এশীয় চেতনা' এসেছে। জাপানের পররাষ্ট্রনীতি ঐ 'এশীয় চেতনা'র দ্বারা প্রভাবিত হবার ফলে সমগ্র এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামে জাপানের সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। বিদেশী কোনও রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধে সম্মানজনক শর্তে সাহায্য নেওয়ায় কোনও দোষ নেই, যদি সে সাহায্য ধার হিসাবে নেওয়া হয় ও পরে শোধ করে দেওয়া হয়। নেতাজী দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গান্ধীজীকে বলেন যে, কূটনীতিতে সবচেয়ে চতুর ইংরাজরা যখন তাঁকে বিপথে চালিত করতে পারে নি, অন্য কোনও দেশের রাজনীতিবিদরাও তাঁকে ঠকাতে পারবে না। তিনি কখনই নিজের দেশের স্বার্থবিরোধী কোনও কাজ করবেন না। ভাষণের শেষে

নেতাজী বলেন, 'হে আমাদের জাতির জনক, ভারতের মুক্তির জন্য এই ধর্মযুদ্ধে আমরা আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা কামনা করি।'

১৯৪৩ সালের শেষের দিকেই উত্তর বর্মার চিনদ্‌উইন নদীর দুই পাশে দুই পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল—পশ্চিমে ইংরাজ, আমেরিকান ও ভারতে অবস্থিত চীনা সৈন্য, পূর্বে জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ। আমেরিকানদের লক্ষ্য ছিল উত্তর বর্মা দিয়ে চীনের সঙ্গে যোগাযোগ খুলে দেওয়া। ইংরাজদের উদ্দেশ্য নদী পার হয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে বর্মা আবার দখল করা। অন্যপক্ষে জাপানীরা বর্মা রক্ষার জন্য ভারতের উত্তর-পূর্বে মণিপুরের ইম্ফলের দিকে ও কোহিমার দিকে আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ঐ ঘাঁটিগুলো দখলে আনতে পারলে ইংরাজদের বর্মার উপর প্রতিআক্রমণের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। নেতাজী চেয়েছিলেন জাপানীদের ইম্ফল ও কোহিমা আক্রমণের সুযোগ গ্রহণ করে আজাদ হিন্দ ফৌজকে ঐ যুদ্ধে সামিল করে ভারতের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। ইম্ফল ও কোহিমার মত বড় সামরিক ঘাঁটি দখলে আনতে পারলে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকার পথ খুলে যাবে। ইংরাজদের ভারতীয় ফৌজে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটানো যাবে এবং দিল্লি অভিযানের পথ সুগম হবে।

আগেই জাপানী সরকার নেতাজীর দাবি মেনে নিয়েছিল যে ভারতে অধিকৃত সব এলাকা আজাদ হিন্দ সরকারের প্রশাসনের আওতায় আসবে। প্রশাসনিক কাজ ও পুনর্নির্মাণের জন্য তিনি সরকারের অধীনে আজাদ হিন্দ দল গঠন করেছিলেন।

১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ আরাকান অঞ্চলে প্রথম আক্রমণ শুরু করে। আজাদি ফৌজের

বাহাদুর গ্রুপের কর্ণেল বুরহানুদ্দীন আজাদি সৈন্যদের নেতৃত্ব দেন। মাউ পর্বতমালার ভেতর দিয়ে টউং বাজারের দিকে চট্টগ্রামের কূল লক্ষ্য করে যুক্ত বাহিনী অগ্রসর হয়। বুথিডং-এর ঘাঁটি থেকে তারা ইংরাজ বাহিনীকে হটিয়ে দেয়। মাইকের সাহায্যে প্রচার চালিয়ে সেনাপতি কর্ণেল মিশ্র ইংরাজদের ভারতীয় বাহিনীর একটা বড় অংশকে নিজেদের দলে টেনে আনতে সমর্থ হন। আজাদ হিন্দ ফৌজ এই প্রথম অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ায় জাপানীরা খুবই উৎসাহিত হয়। আসলে কিন্তু আরাকানে এই আক্রমণ শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য করা হয়েছিল। আসল বড় আক্রমণ ইম্ফলের দিকে করার প্রস্তুতি চলছিল। আরাকানে ইংরাজদের একটি বড় সৈন্যদল ও বিমানবন্দর আটকে থাকলে জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সুবিধা।

১৯৪৪-এর ১৫ মার্চ জেনারেল মুতাগুচির নেতৃত্বে জাপানের পঞ্চদশ আর্মি ইম্ফলের দিকে তাদের ঐতিহাসিক ও দুঃসাহসিক অভিযান আরম্ভ করল। চিন্দউইন নদী পার হয়ে তিন দিক থেকে



ইম্ফল ও কোহিমার দিকে দুর্গম পাহাড় ও নদী পেরিয়ে দ্রুতগতিতে তারা এগোল। মুতাগুচি আশা করেছিলেন যে এপ্রিলের মাঝামাঝি তাঁরা ইম্ফল দখল করবেন। মে মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত তাঁদের ঘাঁটি শক্ত করে নেবার সময় পাবেন তাঁরা। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম ডিভিশনের তিনটি রেজিমেণ্ট, সুভাষ, গান্ধী ও আজাদ, এই যুদ্ধে সামিল হয়। ডিভিশনের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন মহম্মদ জামান কিয়ানি, সুভাষ রেজিমেণ্টের নায়ক শাহ্ নওয়াজ খান, গান্ধী রেজিমেণ্টের নায়ক এনায়েৎ কিয়ানি এবং আজাদ রেজিমেণ্টের গুলজারা সিং। কর্ণেল সৌকত মালিকের নেতৃত্বে বাহাদুর গ্রুপ জাপানী ফৌজের পাশাপাশি ইম্ফল উপত্যকার ময়রাং ও বিষেণপুর পর্য্যন্ত পৌঁছে যায়। সৌকত মালিক ময়রাং-এ তাঁর প্রধান ঘাঁটি করে চার মাস পুরো এলাকাটা নিজেদের দখলে রেখেছিলেন। ইংরাজ ও আমেরিকানদের বিমানবহরের ইতিমধ্যে অনেক শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে এবং প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের সম্ভার তারা ভারতের উত্তর-পূর্বের যুদ্ধক্ষেত্রে এনে ফেলেছে। অন্যপক্ষে জাপানী নৌ ও বিমানবহর প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছে। ফলে বর্মা-ভারত সীমান্তের যুদ্ধে জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে খুবই ছোট বিমান বাহিনী এবং অনেক কম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইম্ফল ও কোহিমার লড়াইয়ের মত এত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আর হয়নি। ঘন জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে ও নদীনালার মধ্য দিয়ে জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে পথ বের করে নিতে হয়েছিল। যোদ্ধা হিসাবে জাপানীদের তুলনা নেই। প্রথমে জাপানী সমর দপ্তর আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে কয়েকটি সংঘর্ষে খুবই কৃতিত্ব

দেখাবার পর আজাদি সৈন্যরা জাপানীদের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। কয়েকশ' মাইলের ফ্রন্টের ভিন্ন ভিন্ন সেক্টরে সংখ্যায় শত্রুপক্ষের চেয়ে অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও আজাদ হিন্দ ফৌজ কী অসীম বীরত্ব, ত্যাগ ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছিল সে বিষয়ে অনেক কাহিনী লেখা হয়েছে।

১৯৪৪-এর ২১ মার্চ নেতাজী যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সমর দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন যে ১৮ই মার্চ আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী ফৌজের পাশাপাশি লড়াই করে বর্মা-ভারত সীমান্ত অতিক্রম করেছে এবং ভারতের মাটিতে স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। ঐ ঘোষণায় সারা পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।

জাপানী সেনাপতি মুতাগুচির হিসাব ভুল হয়েছিল। তিনি আশা করেছিলেন যে ১৫ই এপ্রিল নাগাদ ইম্ফল দখল করতে পারবেন। উত্তরে এপ্রিলের প্রথমেই কোহিমা অবরোধ করতে পারলেও আরও এগিয়ে আসামের রেথপথ দখল করতে পারেন নি, যদিও ঐ ফ্রণ্টে শাহ নওয়াজের সুভাষ রেজিমেণ্ট এগিয়ে গিয়ে কাজটি সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। ইম্ফলে দশ মাইলের মধ্যে পৌঁছে জাপানী ও আজাদি ফৌজ ইম্ফল উপত্যকা ঘিরে ফেলেছিলেন কিন্তু এক বিরাট সামরিক সাফল্যের এত কাছে পৌঁছলেও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, শত্রু বিমানের অবিরাম আক্রমণ ও শত্রুসৈন্যের দ্রুত শক্তিবৃদ্ধির ফলে শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি।

ইম্ফলের যুদ্ধের দক্ষিণ ফ্রণ্টে পালেল টেগনুপাল এলাকায় আজাদ হিন্দ ফৌজের অসীম শৌর্যের কাহিনী প্রত্যক্ষদর্শী জাপানী সেনাপতি ফুজিয়ারা লিখে গেছেন। ৮০ দিন ধরে ঐ ফ্রণ্টে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ চলেছিল। জাপানী ফৌজের দুইপাশে

আজাদি ফৌজের এনায়েৎ কিয়ানির নেতৃত্বে গান্ধী রেজিমেণ্টকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। জাপানীরা অকপটে স্বীকার করেছেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ দুই পাশ থেকে তাদের রক্ষা না করলে এত দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই চালানো তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। এপ্রিলের শেষে কিয়ানির নেতৃত্বে আজাদ রেজিমেণ্ট রাতের অন্ধকারে পাহাড় থেকে নেমে এসে পালেল বিমানঘাঁটির উপর ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে ঘাঁটিটি কিছু সময়ের জন্য দখল করে নিয়েছিল।

জুন মাসের শেষে যুদ্ধের গতি জাপানী ও আজাদী ফৌজের বিরুদ্ধে চলে গেল। একদিকে ইংরাজ ও আমেরিকানদের বিমান বহরের আধিপত্য এবং খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্রের অবাধ সরবরাহের ব্যবস্থা, অন্যদিকে জাপানী ও আজাদী সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে দুর্গম পাহাড় পর্বত নদী নালার মধ্যে সরবরাহের সব পথ একেবারেই বন্ধ। আর আছে অবিশ্রাম বৃষ্টি।

জুনের শেষে জাপানী সর্বাধিনায়ক কাওয়াবে নিরুপায় হয়ে তাঁর সেনাবাহিনীকে পিছু হটতে নির্দেশ দিলেন। নেতাজীকে যখন কাওয়াবে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানালেন তখন নেতাজী দৃঢ় ভাবে বললেন, কোনও বিপ্লবী ফৌজ হার মানে না ও পিছু হটে না। জাপানীরা ফিরে গেলেও আজাদ হিন্দ ফৌজের দিল্লি যাত্রা অব্যাহত থাকবে। কিয়ানিও নেতাজীর সঙ্গে একমত হলেন। কাওয়াবে যুক্তি দেখিয়ে বিনয়ের সঙ্গে নেতাজীকে বোঝালেন যে নিরুপায় হয়ে তিনি ঐ সিদ্ধান্তে এসেছেন। বিপ্লবের পথে এগোবার নিশ্চয়ই আবার সুযোগ আসবে। শেষ পর্যন্ত নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজকে ফিরে আসার হুকুম দিলেন।

নবম পর্ব

আজাদ হিন্দ ফৌজের যোদ্ধাদের ইম্ফলের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার কাহিনী হৃদয়বিদারক হলেও ত্যাগ, সাহস ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমের এক অপূর্ব কাহিনী। খাবার নেই, জলে-কাদায় যানবাহন অচল, ম্যালেরিয়া ও আমাশায় শরীর অবসন্ন, তার ওপর আকাশ থেকে শত্রুবিমানের অবিরাম আক্রমণের মধ্যে ঘন জঙ্গল ও জোর বর্ষায় কূল ছাপিয়ে পড়া নদী-নালা পেরিয়ে এক বিপ্লবী ফৌজ লড়াই করতে করতে ফিরে যাচ্ছে। নেতাজীর ঘনিষ্ঠ অনুগামী আবিদ হাসান এমন একটি গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী লিখে গেছেন। অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। গান্ধী রেজিমেন্টের সহকারী নায়ক শত্রুর কাছে ধরা দেওয়ায় আবিদ হাসানকে তাঁর জায়গা নিতে বলা হল। রেজিমেন্টের সংখ্যা তখন কমে হাজার খানেকে দাঁড়িয়েছে। তিনটি ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের হাসান হুকুম দিলেন জঙ্গলের মধ্যে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে সৈন্য সাজাতে। তাঁরা বললেন 'আমরা সকলে (এবং আপনিও) তিনদিন খাইনি, ফলে লড়বার শক্তি খুবই কম। ট্রেঞ্চ খুঁড়ে শক্তিক্ষয় করব কেন? শত্রু জানে আমরা কোথায়! আমরাও জানি সে কোন্ পথে আসবে। নেতাজীর আশীর্বাদই আমাদের পাথেয়।' পরের দিন ভোরে ইংরাজদের সীফোর্থ হাইল্যাণ্ডারদের একটি পুরো ব্যাটালিয়ন হাসানের দলকে মেসিনগান ও স্টেনগানের সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ করল এবং আজাদি সৈন্যদের কামানগুলিকে স্তব্ধ করে দিল। জবাবে আজাদি সৈন্যরা প্রথমে কৌশলে শত্রুপক্ষের কামানগুলিকে পিছন থেকে অকেজো করে দিয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী শত্রুসৈন্যদের সামনা-সামনি হাতাহাতি লড়াই-এ আহ্বান

করল। সন্ধ্যা হতেই শত্রুসৈন্যরা হার মেনে পাহাড়ের অপর পারে পালিয়ে গেল।

আরও দক্ষিণে ইরাবতী নদীর তীরে প্রতিরক্ষামূলক লড়াই-এ আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ণেল ধীলন ও কর্ণেল সেহগাল তাঁদের নেতৃত্বে আজাদি সৈন্যদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কথা লিখে গেছেন। নেতাজী কর্ণেল আরশাদকে উত্তর বর্মায় পাঠিয়েছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের খাদ্যদ্রব্য দিয়ে যথাসম্ভব চিকিৎসার এবং যানবাহনের ব্যবস্থা করে ফিরিয়ে আনতে। আরশাদ চোখের সামনে হাজার হাজার আজাদি সৈন্যকে শহীদ হতে দেখেছেন। আসাম, মণিপুর ও বর্মার বিস্তৃত রণক্ষেত্রে ভারতের মুক্তির জন্য ভারতের কত সন্তান চরম আত্মবলিদান করে গেছেন।

ইম্ফলের লড়াইয়ে বিপর্যয়ের কথা নেতাজী পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের কাছে গোপন করেন নি। তিনি বলেছিলেন যে আমরা মাত্র একটি রাউণ্ডে পরাজিত হয়েছি, সামনে আরও অনেক রাউণ্ড আছে। দ্বিগুণ উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে তিনি সকলকে ডাক দিয়েছিলেন। সাড়াও পেয়েছিলেন অভূতপূর্ব, দেশের ভিতরে ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন ইংরাজ সরকার নির্মমভাবে দমন করবার পর জাতির মন ভেঙ্গে গিয়েছিল। অবসাদ ও হতাশায়, নেতৃত্বের অভাবে ভারতবাসীরা যেন পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এতবড় সামরিক বিপর্যয়ের পরও পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়রা তাদের যা-কিছু সম্বল সব নেতাজীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারেন। ১৯৪৪-এর ২১শে অক্টোবর রেঙ্গুনে এবং সারা পূর্ব-এশিয়ার সর্বত্র বড় করে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রথম বার্ষিকী পালন করা হয়। ১৯৪৫-এর নেতাজীর জন্মদিন ২৩শে জানুয়ারী

থেকে এক সপ্তাহ 'নেতাজী সপ্তাহ' রূপে পালন করে ভারতীয়রা 'সর্বাত্মক প্রস্তুতি' বা 'টোটাল মবিলাইজেশন'-এর এক বিরাট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

যুদ্ধের সময় নেতাজীর গুপ্তবাহিনীর কার্য্যকলাপের কথা না বললে আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গোপনে শত্রুপক্ষের সামরিক প্রস্তুতি সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ, দেশের মধ্যে নেতাজী অনুগামী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঠিক সময়ে বিদ্রোহ ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির জন্য নেতাজী একদল যুবককে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ১৯৪৩ সালে ছোট ছোট দলে ভাগ করে ডুবো জাহাজে চাপিয়ে এদের ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অতি গোপনে নামিয়ে দেওয়া হয়। দূরপাল্লার আধুনিক মডেলের বেতার যন্ত্র তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেন। গুপ্তবাহিনীর দুইটি দল কলকাতা থেকেই কয়েক



মাস ধরে নেতাজীকে রেডিও মারফৎ গুরুত্বপূর্ণ খবর পাঠাতে সক্ষম হন। গুপ্তবাহিনীর অনেকেই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েন এবং তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের ফাঁসি হয়।

১৯৪৫-এর মার্চ-এপ্রিল মাসে ইংরাজ সৈন্যবাহিনী খুব বড় রকমের অভিযান শুরু করে এবং রেঙ্গুনের দিকে এগোতে থাকে। রেঙ্গুনের পতন যখন অনিবার্য বলে মনে হয়, আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীপরিষদ সিদ্ধান্ত করেন নেতাজীকে কোনমতেই ইংরাজের হাতে বন্দী হতে দেওয়া হবে না। বর্মা থেকে সিঙ্গাপুরে ফিরে গিয়ে তিনি দ্বিতীয় রাউণ্ড যুদ্ধের জন্য নেতৃত্ব দেবেন।

২৩ এপ্রিল ঐ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর নেতাজী বলেন যে আগে ঝাঁসি রানী রেজিমেণ্টের মেয়েদের রেঙ্গুন থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা না হলে তিনি যাবেন না। প্রথমে জাপানীরা ট্রেনে মেয়েদের ব্যাঙ্কক পৌঁছে দেবার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু দীর্ঘ অপেক্ষার পরও তাদের ট্রেনে জায়গা না দিতে পারায় নেতাজী দাবি করেন যে মেয়েদের জন্য লরির ব্যবস্থা করতে হবে। পরের দিন লরির ব্যবস্থা হবার পর নেতাজী মেয়েদের লরিতে তুলে দিয়ে সবশুদ্ধ প্রায় আড়াইশো অফিসার ও সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে রওনা হন। তিন সপ্তাহের ঐ যাত্রায় নেতাজীর অনন্য নেতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ তাঁর সাথীরা দেখেন। যাত্রার কিছুটাই ছিল লরিতে বা গাড়িতে, বেশীর ভাগই পায়ে হেঁটে। শত্রু বিমানের আক্রমণ এড়াতে দিনের বেলায় বনে জঙ্গলে আশ্রয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু জেনারেল জামান কিয়ানিকে নেতৃত্বের ভার দিয়ে তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে মার্চ করে চলেছেন। পথে তিন চারটা বড় নদী পড়ল, ফেরী পাওয়া না গেলে কোমর জলে হেঁটে পার হলেন। দিনের পর দিন নেতাজী গাছের তলায় কম্বল পেতে

বা কোনও বিধ্বস্ত পরিত্যক্ত বাড়ির দালানে ঘুমোলেন। সেখানে যা-কিছু খাদ্য সংগ্রহ করা গেল ঝাঁসী রানীর মেয়েরা কিছু রেঁধে দিলেন এবং সকলে ভাগ করে খেলেন।

মেলিমিন থেকে ব্যাঙ্কক পর্যন্ত ট্রেন পাওয়া গেল। নেতাজী ব্যাঙ্ককে পৌঁছেই সার্বিক পুনর্গঠনের কাজে হাত দিলেন। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সামনের লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হল। নেতাজী নির্দেশ দিলেন যে ইংরাজ ফৌজ মালয় ও সিঙ্গাপুরে নামলে আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রচণ্ড প্রতিরোধ করবে। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে খবর এল যে জার্মানরা আত্মসমর্পণ করেছে এবং পশ্চিম থেকে আমেরিকান, ইংরাজ ও ফরাসী এবং পূর্ব থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার ফৌজ জার্মানি দখল করছে। বোঝাই গেল ইংরাজ ও আমেরিকানরা এরপর সর্বশক্তি দিয়ে জাপানের উপর আক্রমণ শুরু করবে এবং জাপানের অধিকৃত পূর্ব এশিয়ার সব দেশগুলি পুনর্দখলের জন্য লড়াই চালাবে।

বর্মা ছাড়বার আগে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ হুকুমনামায় বললেন, 'এই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের কেবল একটা আদেশই দিতে পারি...যদি আপাতত তোমাদের পরাজয় স্বীকার করতেও হয় তাহলেও আমাদের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা উড্ডীন রেখে যুদ্ধ করতে করতে পরাজয় বরণ কর; বীরের মত পরাজয় স্বীকার কর। পরাজয়ের মধ্যেও আত্মসম্মান ও শৃঙ্খলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রেখে যাও।' তিনি আরও বললেন, 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভারতীয়রা যারা তোমাদের বিরাট আত্মবলিদানের ফলে দাস হিসাবে নয়, স্বাধীন নাগরিক হিসাবে জন্মগ্রহণ করবে, তারা তোমাদের আশীর্বাদ করবে এবং জগতের কাছে সগর্বে ঘোষণা করবে যে তোমরা তাদের পূর্বসূরীরা মণিপুর,

আসাম ও বর্মায় লড়াই করেছ এবং পরাজয় বরণ করে নিয়েছ, কিন্তু সাময়িক অসাফল্যের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত সাফল্য ও গৌরবের পথ প্রশস্ত করেছ।'

জুন মাসের প্রথমে ব্যাঙ্কক থেকে সিঙ্গাপুর পৌঁছে নেতাজী সারা মালয় সফর করে প্রত্যেকটি আজাদ হিন্দ ফৌজের ঘাঁটি মজবুত করার সব ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তাছাড়া বিশ্বযুদ্ধের পট-পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে নিজেদের কর্তব্য ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে সহকর্মীদের সঙ্গে নিরলস আলোচনা চালালেন। ঐ সময়ে দেশ থেকে খবর এল যে ইংরাজ বড়লাট ওয়েডেল কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিয়ে একটা আপোষ রফার প্রস্তাব দিয়েছেন এবং সিমলায় এক সর্বদলীয় সম্মেলন ডেকেছেন। ওয়েডেলের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দেশের জনবল ও অর্থবল পুরোপুরি ব্যবহার করা। দিনের পর দিন নেতাজী বেতারে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে ইংরাজ সরকারের ফাঁদে পা না দিতে আবেদন করলেন। কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি দলের মধ্যে ঐক্যমত না হওয়ায় সৌভাগ্যবশত ওয়েডেলের পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। নেতাজী বার বার দেশের নেতৃবৃন্দকে বললেন, তাঁরা যেন কোনমতেই পূর্ণ স্বাধীনতার ও দেশের ঐক্যের লক্ষ্য থেকে একচুলও সরে না আসেন। বিশ্বরাজনীতির চরিত্র যুদ্ধের পর একেবারে বদলে যাবে। ভারতের স্বাধীনতার দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়াবে যদি না আমরা ইংরাজ সরকারের সঙ্গে একটা অন্যায় ও হীন আপোস রফা করি।

দশম পর্ব

১৯৪৫-এর আগস্ট মাসে সারা পৃথিবীটা যেন ওলটপালট হয়ে গেল। ১০ আগস্ট তাঁর উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে নেতাজী মালয়ের সেরামবাম-এ রয়েছেন। ৬ ও ৯ আগস্ট আমেরিকানরা জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরের উপর ভয়ঙ্কর আণবিক বোমা ফেলল। ১০ আগস্ট গভীর রাতে খবর এল যে সোভিয়েত রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং রাশিয়ার ফৌজ খুব দ্রুতগতিতে মাঞ্চুরিয়ায় এগোচ্ছে। পরের দিন সন্ধ্যায় নেতাজী যথারীতি আজাদ-হিন্দ ফৌজের ক্যাম্পে বক্তৃতা করলেন। গভীর রাতে নেতাজী নিজের ঘরে কাজ করছিলেন, হঠাৎ সিঙ্গাপুর থেকে দুইজন বার্তাবাহী এসে তাঁকে খবর দিল যে জাপান আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য নেতাজী গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। তার পরেই হেসে বললেন, 'যা হবার ত হল! এর পর কি!' একটু পরে আবার হেসে বললেন, 'দেখছ ত, কেবল আমরাই আত্মসমর্পণ করিনি!' তাঁর কথা শুনে তাঁর সাক্ষীরাও খুব হাসলেন।

যত শীঘ্র সম্ভব সিঙ্গাপুর ফিরে যাওয়া উচিত মনে করে মালয়ের বিভিন্ন জায়গায় যে সব উচ্চপদস্থ সহকর্মী ও ফৌজের অফিসাররা ছিলেন তাঁদের সিঙ্গাপুরে নেতাজী ডেকে পাঠালেন। ১২ থেকে ১৪ আগস্ট দিনরাত আলোচনা ও কর্মতৎপরতা চলল। জাপানের আত্মসমর্পণের সরকারি ঘোষণার দেরি হচ্ছিল। কিন্তু জরুরি অবস্থায় যে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন তাতে নেতাজী দেরি করলেন না। 'সারা পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের এবং আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের পদাধিকারীদের বিস্তৃত নির্দেশ পাঠানো হল। ফৌজের ও বেসামরিক সংগঠনের

ছয় মাস কাজ চালানোর জন্য টাকাপয়সার ব্যবস্থা করা হল।

জাপান সরকারিভাবে আত্মসমর্পণ করবার পর আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সঙ্ঘের কর্তব্য সম্বন্ধে সিঙ্গাপুরে অবিশ্রাম আলোচনা হল এবং এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছান গেল। ইংরাজ ফৌজ সিঙ্গাপুর ও মালয় পুনরধিকার করবার পর আজাদ হিন্দ ফৌজের আচরণ কী হবে সে নিয়ে আলোচনা হল। অবশ্যই সকলে জানতেন যে ইংরাজেরা তাদের যুদ্ধবন্দী করবে। রানী ঝাঁসী রেজিমেণ্টের মেয়েদের নিজেদের বাড়ি পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া হল। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, নেতাজী কী করবেন? তিনি কি ইংরাজের হাতে ধরা দেবেন? খোলাখুলিভাবে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হল। নেতাজী সকলকে জানালেন যে তিনি তাঁর মন্ত্রীপরিষদ ও ফৌজের সঙ্গে থাকতে চান। কিন্তু এই একটা প্রশ্নে সহজে কোন সিদ্ধান্ত করা গেল না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আলোচনা চলল। এরই মধ্যে নেতাজী ফৌজের কর্নেল ষ্ট্রেসীকে ডেকে পাঠালেন। কর্নেল ষ্ট্রেসী ও কর্নেল মালিক আজাদ হিন্দ ফৌজের শহীদদের স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভের নক্সা ও মডেল নিয়ে হাজির হলেন। জুলাই মাসের প্রথমেই নেতাজী সিঙ্গাপুরের সমুদ্রের তীরে স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর বসিয়েছিলেন। নেতাজী ষ্ট্রেসীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে ইংরাজ ফৌজ সিঙ্গাপুরে নামার আগেই স্তম্ভটি তৈরি করে ফেলতে পারবেন কিনা। ষ্ট্রেসী দৃঢ়ভাবে জবাব দিলেন যে নিশ্চয়ই পারবেন। তিন সপ্তাহেই স্মৃতিস্তম্ভটি তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু সিঙ্গাপুরে প্রবেশ করার পর ইংরাজ ফৌজের প্রথম কাজই হল স্মৃতিস্তম্ভটি ডাইনামাইট দিয়ে ধ্বংস করা।

১৫ আগস্ট বিকালে টোকিও থেকে সরকারিভাবে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করা হল। সকলের মনে তখন একমাত্র

প্রশ্ন, নেতাজী এখন কী করবেন! সকলেই একমত হলেন যে তিনি অবশ্যই সিঙ্গাপুর ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু কোথায়? ইংরাজদের হাতে নেতাজী বন্দী হন, এটা কেউ চাইলেন না। রাত তিনটার সময় পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হল। ঠিক হল নেতাজী রাশিয়া যাবার উদ্দেশ্যে মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করার চেষ্টা করবেন। রাশিয়ার ফৌজ তখন প্রায় সমগ্র মাঞ্চুরিয়া দখল করে ফেলেছে। প্রশ্ন উঠল, তাঁর সঙ্গে কে যাবেন? নেতাজী আদেশ দিলেন যে তিনি চলে যাবার পর মহম্মদ জামাল কিয়ানি সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকারের মুখ্য প্রতিনিধি হবেন।

১৬ আগস্ট সকালে বিমানে নেতাজী তাঁর দলের অন্যদের নিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাঙ্কক রওনা হলেন। ব্যাঙ্ককে তাঁর উপস্থিতির খবর ছড়িয়ে যাওয়ায় তাঁর বাসভবনে ভীড় উপচে পড়ল। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পরের দিন ভোরে দুইটি বিমানে নেতাজী সাথীদের নিয়ে সাইগন চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হবিবুর রহমান, প্রীতম সিং, এস. এ. আয়ার, গুলজারা সিং, আবিদ হাসান ও দেবনাথ দাস এবং জাপানিদের মধ্যে জাপানি রাষ্ট্রদূত হাচিয়া, জেনারেল ইসোডা ও হিকারি কিকান সংস্থার এক অফিসার। সাইগনে পৌঁছবার পরই হাচিয়া, ইসোডা ও একজন জাপানি সামরিক অফিসার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপানি সর্বাধিনায়ক তেরাউচির সঙ্গে আলোচনার জন্য বিমানে সাইগনের উত্তরে দালাত-এ গেলেন। নেতাজী জানতে চাইছিলেন যে তাঁর গন্তব্যস্থানে অতি দ্রুত পৌঁছে দেবার জন্য বিমানের কী ব্যবস্থা জাপানিরা করতে পারবে।

১৯৪৩ সালের শেষ থেকেই নেতাজী যুদ্ধে জার্মানি ও জাপানের হার হলে বিকল্প পথে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাবার

কথা চিন্তা করছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা ও লক্ষ্য ইংরাজ ও আমেরিকানদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং যুদ্ধের পর দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য্য। সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, তিনি আশা করেছিলেন যে সোভিয়েত রাশিয়া তাঁকে ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য ও সমর্থন করতেও পারে। ১৯৪৩ ও ১৯৪৪-এ তাঁর টোকিও ভ্রমণের সময় জাপানে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তিনি যোগাযোগের চেষ্টা করেন। তাঁর একখানা চিঠি রাশিয়ায় সম্প্রতি পাওয়া গেছে, যদিও সেই সময় তিনি রাশিয়ার তরফ থেকে কোনও সাড়া পান নি। একজন বিপ্লবী হিসাবে নেতাজী লক্ষ্যসাধনের জন্য বিপদের যে কোনও ঝুঁকি নিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। যেমন ১৯৪১-এর মহানিষ্ক্রমণের সময় এবং ১৯৪৩-এ জার্মানি থেকে সাবমেরিনে যাত্রার সময়, তেমনই ১৯৪৫-এর আগস্ট মাসে তিনি আরও একবার জীবনকে বাজি রেখে 'অজানার পথে পাড়ি' দিতে প্রস্তুত ছিলেন। জাপানিরা অবশ্য প্রথমে রাশিয়ানদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করাটা ভাল চোখে দেখেনি। তিনি যখন রাশিয়ানদের অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া যাবার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য প্রস্তাব দিলেন, টোকিওর উপর মহল থেকে ভাল সাড়া পাওয়া যায় নি। কিন্তু জাপানি সেনাধ্যক্ষ তেরাউচি নেতাজীকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর নতুন বৈপ্লবিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা বুঝেছিলেন। দালাত থেকে জাপানি দূতদের নেতাজীকে মাঞ্চুরিয়া যাবার জন্য বিমানের ব্যবস্থা করে দেবার নির্দেশ দিয়ে এলেন। ঐ বিমানে এক খুবই উচ্চপদস্থ জাপানি সেনানায়ক শিদেই মাঞ্চুরিয়া যাচ্ছিলেন। জাপানিরা প্রথমে ঐ বিমানে নেতাজীকে কেবল একটি সীট দেবার প্রস্তাব দেয়। শেষপর্যন্ত চাপাচাপির পর দুইটি সীট দিতে রাজি হয়।

১৯৪৫-এর ১৭ আগস্ট পূর্ব এশিয়া ছেড়ে যাবার আগে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ বিশেষ হুকুমনামা জারি করেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজীর ঐ বাণী এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। নেতাজী বলেছিলেন ঃ

'...আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আমরা এক অভাবনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি। আপনারা হয়ত মনে করতে পারেন যে দেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে আপনারা বিফল হয়েছেন। কিন্তু আমি আপনাদের বলতে চাই যে এই অসাফল্য সাময়িক। কোনও বিপর্যয় বা ব্যর্থতা আপনাদের অতীতের বিরাট কীর্তি ম্লান করে দিতে পারে না।...আপনাদের বহু সহযোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন এবং তাঁরা স্বাধীন ভারতে অমর শহীদ বলে পরিগণিত হবেন।...

'এই অন্ধকার মুহূর্তে আমি আপনাদের নির্দেশ দিচ্ছি যে সত্যিকারের এক বিপ্লবী ফৌজের যোগ্য অনুশাসন, আত্মসম্মান ও শক্তি আপনারা দেখান। ইতিপূর্বেই যুদ্ধক্ষেত্রে আপনারা সাহস ও ত্যাগের প্রমাণ দিয়েছেন। বর্তমানের সাময়িক পরাজয়ের সময় আপনাদের কর্তব্য হবে অপরাজেয় আশা ও অবিচলিত আত্মশক্তি প্রদর্শন করা।

'...আমি মনে করি এই সঙ্কট মুহূর্তে আটত্রিশ কোটি আমাদের দেশবাসী আমাদের দিকে, ভারতের মুক্তি ফৌজের দিকে চেয়ে আছেন। সুতরাং ভারতের প্রতি চির অনুগত থাকুন এবং এক মুহূর্তের জন্যও ভারতের অদৃষ্টে বিশ্বাস হারাবেন না। দিল্লির পথ অনেক এবং দিল্লিই আমাদের লক্ষ্য হয়ে রইল। আপনাদের এবং আপনাদের সহযোদ্ধাদের আত্মবলিদান নিশ্চয়ই পূর্ণ সাফল্য এনে

দেবে। জগতে এমন কোনও শক্তি নাই যা ভারতকে দাস করে রাখতে পারে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই এবং শীঘ্রই হবে। জয় হিন্দ!'

১৯৪৫-এর ১৭ আগস্ট বিকাল পাঁচটা পনেরো মিনিটে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সাইগন বিমান বন্দর থেকে হবিবুর রহমান ও অন্য জাপানি সহযাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে 'অজানার পথে পাড়ি' দিলেন। তিনি আর ফিরলেন না।

একাদশ পর্ব

যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী শেষ হয়ে যায়নি। নেতাজী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে যুদ্ধের পরে তাঁর ফৌজ যখন দেশে ফিরবে এবং দেশের মানুষ তাদের বীরত্বপূর্ণ কার্য্যকলাপের কথা জানতে পারবে তখন দেশে একটা নবজাগরণ আসবে। তাছাড়া, ইংরাজদের ভারতীয় ফৌজ যখন পূর্ব এশিয়ায় প্রবেশ করবার পর দেখবে যে তাদেরই ভাইরা এক আজাদি ফৌজ গঠন করে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে, তাদের মধ্যেও একটা মানসিক বিপ্লব ঘটে যাবে। বিদেশী রাজার জন্য যুদ্ধ করাটা যে দেশের স্বার্থের বিরোধী সেটা তারা বুঝতে পারবে।

১৯৪৪ ও ১৯৪৫-এ ইম্ফল ও বর্মার লড়াই-এর সময় হাজার হাজার আজাদি ফৌজের অফিসার ও সৈনিক ইংরাজদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই দেশে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে ঐ বন্দীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। জওহরলাল নেহরু ১৯৪৫ সালে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর ইংরাজ সরকারকে সাবধান করে দিয়ে বললেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার দেশের লোক সহ্য করবে না। সেপ্টেম্বরে মুক্তি পাবার পর শরৎচন্দ্র বসু দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে আজাদি ফৌজের প্রতি সামান্যতম দুর্ব্যবহার করা চলবে না। তিনি জাপানের উপর আণবিক বোমা ফেলারও জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন।

যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন দেশের ভিতরে স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরোপুরি ভাটা পড়েছে। দেশের মানুষ ও সব রাজনৈতিক দল দিশেহারা ও হতাশাগ্রস্ত। যুদ্ধে জয়ী হবার পর ইংরাজ সরকার আমাদের প্রতি আরও উদ্ধত, কঠোর ও অনমনীয় মনোভাব দেখাবে,

তাই প্রত্যাশা ছিল। ঠিক ঐ সময়ে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরাট কীর্তি, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কাহিনী দেশের জনমানসে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত এসে পড়ল। ভারতবাসীরা যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেলেন। সব রাজনৈতিক দলগুলি, কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা, এমন কি কম্যুনিষ্টরাও এই নতুন দেশপ্রেমের জোয়ারের পূর্ণ সুযোগ নিলেন। তাঁরা সকলেই রাতারাতি নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের গুণগ্রাহী ও সমর্থক হয়ে উঠলেন। অন্য দিকে ঔদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী সরকার দেশের মানুষকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য তিনজন আজাদি ফৌজের অফিসার—শাহ নওয়াজ, সেহগল ও ধীলনকে দিল্লির লাল কেল্লায় সামরিক আদালতে বিচার করে শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। সাম্রাজ্যবাদীদের হিসাবে কিন্তু ভুল হয়ে গিয়েছিল এবং ভারতের পক্ষে শাপে বর হল। সারা দেশ নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থনে গর্জে উঠল। কংগ্রেস দল বিশিষ্ট আইনজীবীদের নিয়ে এক প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন করলেন। তার মধ্যে ছিলেন তেজ বাহাদুর শাপ্রু, ভুলাভাই দেশাই, কৈলাস নাথ কাটজু প্রভৃতি। এমনকি জওহরলাল নেহরু, যিনি জীবনে কোনওদিন আইন ব্যবসা করেন নি, কালো পোষাক চড়িয়ে তিনিও লাল কেল্লায় হাজির হলেন। ১৯৪৫-এর নভেম্বর থেকে ১৯৪৬-এর জানুয়ারী পর্যন্ত দুই মাস লাল কেল্লায় বিচার চলল। বিচারের বিবরণী দেশে সব খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছিল। সেগুলি পড়ে দেশের মানুষ জানতে পারলেন যে দেশের ভিতরে স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যাবার পর নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ স্বাধীনতার পতাকা মাথায় তুলে নিয়ে এক মরণপণ লড়াই চালিয়েছিলেন। ইংরাজদের সামরিক আদালত যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের দুইজন মুসলমান অফিসার আবদুল রশীদ ও বুরহানুদ্দীনকে অভিযুক্ত করে কাঠগড়ায়

দাঁড় করালেন তখন জিন্না সাহেব ও মুসলীম লীগও সক্রিয়ভাবে তাঁদের সমর্থনে এগিয়ে এলেন।

আজাদি ফৌজের অফিসারদের বিচারে ভুলাভাই দেশাই যে জোরদার ও যুক্তিপূর্ণ সওয়াল করেছিলেন সেটা একটা অনন্য ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ইংরাজের সামরিক আদালত আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত অফিসারদের দোষী সাব্যস্ত করলেও জনমতের চাপে ইংরাজ সরকার তাঁদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

১৯৪৫-এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চ পুরোপুরি অধিকার করে ছিলেন। ১৯৪৫-এর সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে অবলম্বন করে বিপুলভাবে জয়ী হলেন। সেই সময় যদি নেতাজী দেশে ফিরে আসতেন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতবাসী যে তাঁকে ক্ষমতার শিখরে বসিয়ে দিত সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। আমাদের উপর আধিপত্য বজায় রাখার ইংরাজদের শেষ অস্ত্র ছিল তাদের ভাড়াটে ভারতীয় ফৌজ। এদের বিদেশী সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য নষ্ট করে দিয়ে নেতাজী ভারতে ইংরাজ রাজত্বের শেষ ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতে ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ অকিনলেক খবর নিয়ে জানলেন যে ভারতীয় ফৌজের অধিকাংশই আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়েছে। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরাজদের নৌবাহিনীতে ব্যাপক বিদ্রোহ হল। বিদ্রোহীরা করাচি ও বোম্বাই বন্দর অবরোধ করলেন। ইংরাজদের বিমান বাহিনীতেও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থনে সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘট ও ছাত্র-যুবদের আন্দোলন এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করল।

কিন্তু ঐ বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে ইংরাজের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার মত নেতৃত্ব ভারতে ছিল না। নেতাজীর অনুপস্থিতিতে আজাদ হিন্দ ফৌজও কোনও সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা নিতে পারল না। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানে দেশের নেতৃত্ব ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি থেকে দেশে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হল। ইংরাজ সরকার তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং ভারতের রাজনীতির চাবিকাঠি আবার ফিরে পেলেন।

নেতাজী তাঁর 'জীবনের বাণী'তে বলেছেন, পৃথিবীতে সবই নশ্বর ও বিনাশ পায়। কিন্তু মানুষের আদর্শ ও স্বপ্ন অমর। মানুষ তার আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারে কিন্তু তার মৃত্যুর পর সেই স্বপ্ন ও আদর্শ ভবিষ্যতের প্রজন্মের মধ্যে আবার জন্মলাভ করে। এই ভাবেই ইতিহাসে বিবর্তনের চাকা ঘুরতে থাকে। কোনও আদর্শই দুঃখভোগ ও আত্মত্যাগ ছাড়া সফল হয়নি। সুতরাং আদর্শের জন্য মানুষ দুঃখ ও ত্যাগ বরণ করে নিয়ে কিছুই হারায় না। সে এক অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের স্বাধীনতার জন্য অশেষ দুঃখ ও ত্যাগ বরণ করে নিয়ে জগতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। আজাদ হিন্দ-এর আদর্শ ও প্রেরণা ভারতের ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে আবার জন্মলাভ করবে এবং আমাদের দেশকে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

Laser typeset at Ess Ess Enterprises, New Delhi
and printed at the Central Electric Press, New Delhi